Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেক্যুলারিজম না শারীয়াহ কোনটা উত্তম কেন উত্তম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিহা আকবার শিফা

রোলঃ 216021457

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেক্যুলারিজম না শারীয়াহ কোনটা উত্তম কেন উত্তম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিহা আকবার শিফা

রোলঃ 216021457

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সেক্যুলারিজম না শারীয়াহ কোনটা উত্তম কেন উত্তম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সামিহা আকবার শিফা, আইডিঃ 216021457 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সেক্যুলারিজম না শারীয়াহ কোনটা উত্তম কেন উত্তম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Samiha Akbar Shifa

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সামিহা আকবার শিফা

আইডিঃ 216021457

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

সেকুলারিজমের সংজ্ঞা ও বৃত্তান্ত :

(বিভিন্ন পরিভাষায়)

১। Encyclopedia Americana এর ২৪নং Volume এ সেকুলারিজমের সংজ্ঞা নিম্নরূপ প্রদান করা হয়েছে:-

• সেকুলারিজম একটি নৈতিক ব্যবস্থা, যা কেবল প্রাকৃতিক নৈতিকতার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঐশী সূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম বা রহস্যবাদমুক্ত।

২। Holyoake যিনি সেকুলারিজম নামকরণের প্রথম উদ্যোক্তা এবং যিনি Secular Society গঠন করে এর পক্ষে প্রথম আন্দোলন শুরু করেন, তার লিখিত A Confession of Belief বইতে যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে:-

• সেকুলারিজম হল এক ধরনের মতামত যা ইহজগতে এই জীবনের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা সম্ভব বিষয়গুলোকে স্পর্শ করে।

৩। English Secularism বই'র প্রদত্ত সংজ্ঞা:

• সেকুলারিজম এমন একটি কর্তব্য পালন পদ্ধতি, যা শুধু ইহজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ও কেবলমাত্র মানবীয় বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের জন্য যারা ধর্মতত্ত্বকে অস্পষ্ট, অপূর্ণ, অনির্ভরযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য মনে করে।

Oxford Dictionary তে Secularism এর সংজ্ঞা:

• সেকুলারিজম এমন একটি মতবাদ, যে মতবাদে মানবজাতির ইহজগতের কল্যাণ চিন্তার উপর গড়ে উঠবে এমন এক নৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে থাকবে না কোন ধরনের আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাসভিত্তিক বিবেচনা।

Encyclopedia বা বিশ্বকোষে Secularism এর নিম্নরূপ দুটো সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে:

১.

সেকুলারিজম হচ্ছে এমন একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন যা সকল ধর্ম বিশ্বাসকেই প্রত্যাখ্যান করে।

২.

সেকুলারিজম এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সাধারণ শিক্ষা ও সামাজিক সংস্থা পরিচালনায় কোন ধরনের ধর্মীয় উপাদান অন্তর্ভুক্ত হবে না।

•Random House Dictionary of English Language গ্রন্থে Secularism এর তিনটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে:

১.সেকুলারিজম এমন একটি মতবাদ যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয়।

২• যা কোনভাবেই ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়।

৩• ধর্মীয় আইন-কানুন বহির্ভূত ব্যবস্থা।

The Advanced Learners Dictionary of Current English এ সেকুলারিজমের প্রদত্ত সংজ্ঞা :-

-Worldly or material, not religious or spiritual.

• ল্যাটিন শব্দ- Saeculum থেকে Secular শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। Saeculum এর অর্থ যুগ, জেনারশন। পরিভাষাগত ভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়- যা ইহজগত, বর্তমান দুনিয়া ও এই জীবন সম্পর্কিত। এটা ব্যবহৃত হয় ঐ আদর্শের শিরোনাম হিসাবে যে আদর্শ স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ (ওহী) বাদ দিয়ে সমসাময়িক সমাজ বিনির্মাণ করেছে।

Graeme Smith আরো বলেন:-

◇ এটা নির্ভয়ে বলা যায় যে, মূলত: খ্রিস্টবাদ থেকেই সেকুলারিজমের জন্ম। এটা না বুঝার কোন কারণ নাই যে, সেকুলার আইডিয়ার মূল জড় খ্রিস্টবাদের অভ্যন্তরে নিহিত।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর সারসংক্ষেপ:

Secular ইংরেজী ভাষার একটি শব্দ। এ শব্দটি ল্যাটিন ভাষার Saeculum শব্দ থেকে এসেছে। Saeculum শব্দের অর্থ হল-ইহজগত। পরিভাষাগতভাবে এর অর্থ দাড়ায়-ইহজগত, বর্তমান দুনিয়া ও ইহজীবন সম্পর্কিত বিষয়াদি।

সেকুলারিজম এমন এক সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন যা মানবজাতির ইহজাগতিক কল্যাণ চিন্তার উপর গড়ে উঠেছে। এর আওতাধীন বিষয়গুলো ইহজগতের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা করার সম্ভব। মানবরচিত এ মতবাদ ইহজগতের বাইরে পরজগত নিয়ে মাথা ঘামায় না। এ মতবাদ 'ওহীর' মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান অস্বীকার করে, ধর্মকে অস্পষ্ট, অপূর্ণ, অনির্ভরযোগ্য ও অবিশ্বাস্য মনে করে। এ মতাদর্শ মানুষের সামষ্টিক ব্যাপারও শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মকে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট করতে রাজী নয়। এ মতবাদ সৃষ্টিকর্তা ও পরকাল স্বীকার করেনা- অন্যকথায় সেকুলারিজম ধর্মীয় বিশ্বাসকে করে প্রত্যাখ্যান।

যে মতবাদটিকে ইংরেজিতে secularism বলা হয় তার আরবি প্রতিশব্দ হিসেবে বহুলভাবে علماني ['আলমানি] শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আর বাংলায় এর (সত্যের অপলাপকৃত) অনুবাদ করা হয় 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' শব্দ দিয়ে। তাহলে দেখা যাক সে সেকুলারিজম (বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা) কী? ছোট্ট একটি প্রশ্ন, কিন্তু তার উত্তর চাই স্পষ্ট, নিখুঁত ও বিস্তারিত। এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রত্যেক মুসলিমের জানা-থাকা জরুরি। আল্লাহর মেহেরবানী যে, এ পর্যন্ত সেকুলারিজমের উপর বহু গ্রন্থ লিখা হয়েছে, আমাদের কর্তব্য শুধু জানা ও আমল করা।

এবার প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করি, তবে এ জন্য আমাদের বেশী কষ্ট করতে হবে না, কারণ যেখানে 'সেকুলারিজম' বা তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' মতবাদের জন্ম, সে পাশ্চাত্য দেশসমূহে লিখিত অভিধানগুলো আমাদেরকে সেটার অর্থ খোজা ও সন্ধান করার কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছে। ইংরেজি অভিধানে secularism শব্দের নিম্নরূপ অর্থ এসেছে:

১. পার্থিববাদী অথবা বস্তুবাদী।

২. ধর্মভিত্তিক বা আধ্যাত্মিক নয়।

৩. দ্বীনপালনকারী নয়, দুনিয়াবিমুখ নয়[1]।

একই অভিধানে secularism শব্দের সংজ্ঞায় এসেছে:

"secularism এমন একটি দর্শন, যার বক্তব্য হচ্ছে, চরিত্র-নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না"।

Encyclopedia Britanica নামীয় ব্রিটিশ বিশ্বকোষে Atheism বা 'নাস্তিকতা' শিরোনামের অধীন secularism এর আলোচনা এসেছে। তাতে Atheism তথা নাস্তিকতাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. তাত্ত্বিক নাস্তিকতা (إلحاد نظري)

২. ব্যবহারিক নাস্তিকতা (إلحاد عملي)।

'বিশ্বকোষ' সেকুলারিজমকে দ্বিতীয় প্রকার নাস্তিকতার অন্তর্ভুক্ত করেছে।এ আলোচনা থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হল:

এক. সেকুলারিজম একটি কুফরি দর্শন, তার একমাত্র লক্ষ্য দুনিয়াকে দ্বীনের প্রভাব মুক্ত করা। সেকুলারিজম একটি মতবাদ, তার কাজ হচ্ছে পার্থিব জগতের সকল বিষয়কে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত রেখে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আদর্শিক ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার নিজের তৈরি বিধান দেওয়া ও সকল স্তরে নেতৃত্ব প্রদান করা।

দুই. সেকুলারিজমের সাথে জ্ঞান বা বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই, যেমন কতক কুচক্রী মানুষদেরকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলার জন্য বলে, সেকুলারিজম অর্থ 'ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উপর গুরুত্বারোপ ও তার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা'। এ বক্তব্যের অসারতা ও সত্য গোপন করার অপকৌশল আমাদের বর্ণিত অর্থ থেকে স্পষ্ট, যা আমরা গ্রহণ করেছি 'সেকুলারিজম' এর সুতিকাগার থেকে, যে সমাজে তার জন্ম ও পরিচর্যা হয়েছে।তাই 'সেকুলারিজম' এর অর্থ যদি করা হয় ধর্মহীনতা, তাহলে তার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা ও সঠিক অর্থ প্রকাশ পাবে এবং তাতে অপলাপের কিছু থাকবে না, বরং যথার্থ অর্থই স্পষ্ট হবে।

•

একইসাথে সেক্যুলারিজমের দালিলিক এবং তাত্ত্বিক দিক নিয়ে কথা বলা হবে। দালিলিক দিক থেকে সেক্যুলারিজমের তাত্ত্বিক দিকটা বুঝা বেশি জরুরি এবং এটা বেশ শক্তিশালীও বটে।

সেক্যুলারিজমকে দুইভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সংজ্ঞাগতভাবে এবং ফলগতভাবে। সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞাগত দিকটা তার ফলগত অবস্থানের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

সংজ্ঞাগতভাবে সেক্যুলারিজম হলো রাষ্ট্র সব ধর্ম ও মতের প্রতি নিরপেক্ষ থাকবে। রাষ্ট্র নিজে কোনো ধর্ম গ্রহণ করবে না। রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সংবিধান মোতাবেক চলবে আর ব্যক্তি তার মতো করে ধর্ম পালন করবে। রাষ্ট্রের কাজে ধর্মের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। উল্লিখিত সংজ্ঞার বিচারে সেক্যুলারিজমের আবার দুটি দিক বেরিয়ে আসে।

১। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা।

২। সব মতের প্রতি সমান ও নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করা।

এক. ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার অর্থ হলো ধর্মীয় নির্দেশনা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকা। ব্যক্তিগত জীবন কেবলই ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি ব্যক্তির জীবনাচারের পরিধি নিজ সত্তা পেরিয়ে সন্তান, বউ, মা-বাবা, ভাই-বোনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তখন তা আর ব্যক্তিগত জীবন থাকে না; সমষ্টিগত জীবন (public life) হয়ে যায়। এই সীমা অতিক্রম করলেই ব্যক্তির উপর হিউম্যান রাইটস-এর বিধান প্রয়োগ হওয়া শুরু করে। যার ফলে সে তার স্ত্রী-সন্তানদের বিষয়েও কোনো প্রকার হিউম্যানিজমবিরোধী হস্তক্ষেপ করার অধিকার হারিয়ে ফেলে। মোদ্দকথা, ব্যক্তিগত জীবন শুধুই 'আমি'র মাঝে সীমাবদ্ধ। 'আমি'-এর বাইরে গেলেই শুরু হয়ে যায় পাবলিক লাইফ। বুঝতেই পারছেন ধর্মকে এরা কোথায় নিক্ষেপ করতে চায়। বাস্তবতা হলো, সেক্যুলারিজম ব্যক্তি- জীবনকেও প্রভাবিত করে। কারণ, সেক্যুলারিজমের মূল সংঘর্ষ স্রষ্টা কিংবা ধর্ম অস্বীকার করা নয়। এটা গৌণ বিষয়। সেক্যুলারিজমের মূল উপাদান হলো আল্লাহ এবং দীনের প্রভাব ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করা। ধর্মীয় প্রভাব অস্বীকারের ব্যাপারটি জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রেই হতে পারে। মুসলিমদের অনেকেই নিজেদের প্রফেশনাল লাইফকে দীনের প্রভাব থেকে মুক্ত মনে করে। ফলে দেখা যায় কোনো কাজকে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সত্তাগতভাবে হারাম মনে করলেও পেশা হিসেবে বৈধ মনে করছে।

এটা মুসলিম জীবনে সেক্যুলারিজমেরই প্রভাব। অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্রিকেটারসহ অনেক হারাম ক্যারিয়ারিস্ট মুসলিম ব্যক্তি-জীবনে নামাজ- রোজা পালন করছে; কিন্তু পেশা হিসেবে সুস্পষ্ট হারাম কাজগুলো বৈধ মনে করছে। এমন আচরণ সেক্যুলারিজমেরই প্রভাব। আবার এই অস্বীকৃতি একান্ত ব্যক্তি-জীবনেও হতে পারে। ব্যক্তির চিন্তা ও মনন থেকে যদি আল্লাহর কর্তৃত্বের ধারণা হারিয়ে যায়, ধর্মের প্রভাব প্রত্যাখ্যাত হয় তবে তা সেক্যুলারিজমেরই অংশ। ধর্মীয় বিধানাবলিকে নিছক ওহির টেক্সট থেকে গ্রহণ না করে নিজস্ব আকল কিংবা বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে গ্রহণ করার মতো ব্যক্তিগত প্রবণতা ধর্মীয় কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করারই ভিন্ন চিত্র। এজন্য কেউ নিয়মিত কিছু ধর্মীয় আচার পালন করেও ধর্মীয় কর্তৃত্বের জায়গায় অস্বীকারকারী

হতে পারে। মুসলিম সমাজে এমন লোকের অভাব নেই বর্তমানে। সুতরাং সেক্যুলারিজম কেবল রাষ্ট্র, অর্থনীতি এবং সমাজের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তি-জীবনে হস্তক্ষেপ করাও এর বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কেউ সেগুলোর অনুসরণ করতে পারবে না। এখন প্রশ্ন হলো, এভাবে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করার ব্যাপারে ইসলাম কী বলে? রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলমানরা কার কর্তৃত্ব মেনে নেবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়সহ সর্বত্র কার বিধান চলবে?

এই ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। ইসলাম এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ফলে ইসলাম তার অনুসারীদের সর্বত্রই তার কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার নির্দেশ দেয়। কোনো ক্ষেত্রে এর কর্তৃত্ব অস্বীকার করলে ইসলাম তাকে নিজ অনুসারীদের কাতারে জায়গা দেয় না। নবীগণের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল উলুহিয়্যাত, উবুদিয়্যাত।

সুরা নাহলের ৩৬নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন, 'আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন রাসুল পাঠিয়েছি, এই নির্দেশ দিয়ে যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।'

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে নবী-রাসুলদের দাওয়াতের মূল আহ্বান ছিল তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ। তার মানে এই নয় যে তারা তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর অস্বীকৃতিকে মেনে নিতেন। আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, বিশ্বপরিচালনাকারী সত্তা হিসেবে স্বীকার করত; ; কিন্তু তাকে একমাত্র মাবুদ ও হাকিম হিসেবে মানত না। আল্লাহর উবুদিয়্যাত এবং হাকিমিয়্যাত অস্বীকার করত। আর সেক্যুলারিজমের মূল কাঠামোই 'আল্লাহর উবুদিয়্যাত এবং হাকিমিয়্যাত প্রত্যাখ্যান করা', যাকে মহান আল্লাহ জাহিলিয়্যাত বলেছেন।" আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে বাদ দিয়ে জাহিলিয়্যাত গ্রহণ করাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুফর এবং শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন।"

হেদায়েত ও শ্রেষ্ঠত্বের সার্টিফিকেট গ্রহণকারী উম্মাহর মহান সালাফ ও পূর্ববর্তী ইমামগণ এবং বর্তমান আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, 'ফাসলুদ দীন আনিদ দাওলাহ আও আনিস সিয়াসাহ' তথা রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা সুস্পষ্ট কুফুর। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُون

তারা কি জাহিলিয়্যাতের শাসনব্যবস্থা কামনা করে! বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য শাসন-পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে আছে?

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এমন ব্যক্তির নিন্দা করেছেন, যে আল্লাহর অকাট্য বিধান ছেড়ে দেয়; অথচ তা সকল কল্যাণ সমন্বিত করে, সকল ক্ষতিকারক বস্তু নিষিদ্ধ করে। আল্লাহর বিধান ছেড়ে দিয়ে সে ফিরে যায় এমন মতামত, রীতিনীতি ও প্রথার দিকে, যা প্রণয়ন করেছে মানুষ, আল্লাহর শরিয়তের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই, যেমনটা করত জাহেলি যুগের মানুষেরা। তারা তাদের চিন্তাপ্রসূত মত থেকে প্রণীত জাহেলি ভ্রান্ত বিধান দ্বারা ফয়সালা প্রদান করত। যেমন, তাতাররা তাদের সেসব রাষ্ট্রীয় আইনকানুন দিয়ে বিচার-ফয়সালা করেছে, যা তারা গ্রহণ করেছে তাদের বাদশাহ চেঙ্গিস খান থেকে। চেঙ্গিস খান তাদের জন্য 'ইয়াসিক' নামক সংবিধান প্রণয়ন করেছে। ইয়াসিক হলো ইসলামি, নাসরানি, ইহুদিসহ বিভিন্ন শরিয়তের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংবিধান। তাতে এমন অনেক বিধান আছে, যা সে শুধু নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা থেকেই গ্রহণ করেছে। তারপর তা তার অনুসারীদের নিকট পরিণত হয়েছে অনুসরণীয় সংবিধানরূপে। একে তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করার উপর অগ্রাধিকার দেয়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে কাফের। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব, যতক্ষণ সে আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিধানের দিকে ফিরে না আসে এবং কমবেশি যাই হোক, যেকোনো ব্যাপারে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কিছুকে ফয়সালাকারী হিসাবে গ্রহণ না করে।”

আল্লামা মুসতফা সাবারি” রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করা আর দীনে ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এই দুই বিশ্বাস কখনো এক হতে পারে না।'

তিনি আরো বলেন, 'কোনো মুসলমান যদি তার সাধারণ সামাজিক জীবনে দীনের এই কর্তৃত্ব মেনে না নেয় যে, দীন তাকে আদেশ ও নিষেধ প্রদান করবে এবং তার কার্যাবলির মধ্যে দখল দেবে, তা হলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি কীভাবে খারিজ হবে না, যে রাষ্ট্রীয় জীবনে এই কর্তৃত্ব এবং এই দখলদারত্ব মেনে না নেবে! ,১১৬

আল্লামা জাহেদ কাউসারি রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট কুফুর।
শাইখ সালেহ আল ফাওজান রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করার মতাদর্শ গ্রহণ করবে সে কাফের।

বাংলাদেশের উচ্চতর ইসলামি আইন ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা'র মুদির মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ তার এক বক্তব্যে ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কিছু নেই। ইসলামের ভিত্তি হলো আল্লাহর কালাম কুরআন মজিদ।

তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা সমার্থক। এবং এর সবচেয়ে হালকা ব্যাখ্যাদাতারও দাবি হলো, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না, যা স্পষ্টতই কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থি।”

সংজ্ঞাগতভাবে সেক্যুলারিজমের দ্বিতীয় দিক হলো সকল মতের প্রতি উদার ও নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করা। ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যেকে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার যেই মাপকাঠি গ্রহণ করবে, তা মেনে নেওয়া। অন্যভাবে বললে, টলারেন্স-এর উদ্দেশ্য হলো, ভিন্নমতকে শুধু মেনে নেওয়াই নয়; বরং ভালো-মন্দের ধারণাগুলোর ভিন্নতাকে গুরুত্বহীন এবং অনর্থক মনে করা। স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতিকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করার দাবি হলো, কেউ নিজের কল্যাণের ধারণার ভিত্তিতে অন্যকারো সমালোচনা করার কিংবা পরিবর্তন করার অধিকার রাখে না। এমনকি একজন পিতা তার সন্তানকেও নামাজ পড়ার জন্য জোরজবরদস্তি করতে পারবে না। জীবনপরিচালনার প্রতিটি পদ্ধতি সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমানভাবে মেনে নেওয়ার নাম টলারেন্স। যখন প্রত্যেকের ব্যক্তিগত খায়েশ পূরণ এবং জীবনপরিচালনার সমস্ত পদ্ধতি ও ধারণা সমান মর্যাদার, তখন প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক হলো অন্যের খায়েশ ও প্রবৃত্তি মেনে নেওয়া এবং তাকে সম্মান করা।

সেকুলারিজমের উদ্ভব, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান এবং রেনেসাঁ ও আধুনিক যুগের সূচনা হয়। ১৪৫৩ সালে তুরস্কের উসমানী সাম্রাজ্যের খলিফা সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহর হাতে রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্টানটিনেপুল (ইস্তাম্বুল) এর পতন হয়। ৩২৪ সালে রোম সম্রাট কন্‌স্টনটাইন তুরস্কের ইস্তাম্বুল দখল করে রোম থেকে রাজধানী স্থানান্তর করে এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ইস্তাম্বুলের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখেন "কস্টানটিনেপল।” বায়জান্টিয়ান সম্রাটগণ এখান থেকে ভূমধ্যসাগরের উভয়পারে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় দাপটের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তাদের রাজত্বকালে ইউরোপের বিভিন্ন এলাকার শিক্ষার্থীরা কস্টানটিনেপল, বাগদাদ, দামেস্ক,

বৈরুত, কায়রো, গ্রানাডা, কর্ডোভা ইত্যাদি মুসলিম অধ্যুষিত স্থানের বিদ্যাপীঠগুলোতে লেখাপড়া করতে আসে। কনস্টানটিনেপলের পতনের পর তারা ইউরোপে ফিরে আসে। আসার সময় তারা বই-পুস্তক, গবেষণালব্ধ তথ্য ও তত্ত্ব এবং অতীতের পাণ্ডুলিপি সাথে নিয়ে আসে। তাছাড়া এ সময় আরবী থেকে বহু মূল্যবান বই-পুস্তক ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ফিরে এসে তারা ইউরোপের প্রধান নগরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলে।

এবার তারা পুরোদ্যমে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে জীবনমান উন্নত করার পথে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে মুসলমানদের আবিষ্কৃত সমুদ্রযাত্রার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সাগর মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তারা আমেরিকা, কানাডা, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশসমূহে যেতে সক্ষম হয়। ফলে সমুদ্রপথে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার হয়। আফ্রিকা থেকে দাস নিয়ে ব্যবসা, খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও প্রাপ্তি, কলোনী স্থাপন এবং শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে তারা আর্থিক দিক দিয়ে প্রভূত উন্নতি সাধন করে।এ সময় তাদের বুদ্ধিজীবীরা গীর্জা ও পোপের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করতে মনোনিবেশ করে। তাদের স্মরণ হয় পোপ ও যাজকরা তাদেরকে ক্রুসেডে (ধর্মযুদ্ধে) শরীক হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং বলেছিল-স্বয়ং God Son যিশু নিজে এ অভিযানে নেতৃত্ব দিবেন। অথচ বার বার তাদেরকে ক্রুসেডে পর্যদুস্ত হয়ে ফিরে আসতে হয়। দীর্ঘ এগারশত ত্রিশ বছরের রাজধানী কনস্টানটিনেপল বাধ্য হয়ে ছেড়ে আসতে হয়।

যাজকদের নিয়ন্ত্রণ আরোপের কারণে অতীতে তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে এবং নতুন কিছু আবিস্কার করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাদের বহুলোককে আগুনে পুড়িয়ে এবং অন্যান্য পন্থায় হত্যা করা হয়। ঐ সময় খ্রিস্টধর্ম ও বিজ্ঞান এবং যাজক শ্রেণী ও চিন্তাবিদদের মধ্যে যে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তার একটা সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর লিখা Islam and The World বইতে :

"প্রথমদিকে খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে অতঃপর ক্রমান্বয়ে সাধারণভাবে ধর্মের বিরুদ্ধেই বৈরিতা সৃষ্টি হয়ে যায়। যে যুদ্ধ প্রথমদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির পতাকাবাহী ও খ্রিস্টধর্মের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিল, পরে তা বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সংঘাতের রূপ ধারণ করে। একপক্ষ হয়ে যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান আর ধর্ম হয়ে যায় প্রতিপক্ষ। উভয়ের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। ফলে প্রগতিবাদী ও মুক্তবুদ্ধির পতাকাবাহীরা নিজ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান এক সাথে অবস্থান করতে পারে না। এজন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি বিশ্বস্ততা প্রমাণের নিমিত্তে প্রয়োজন হয় ধর্মের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এদের সামনে যখন ধর্মের নাম উচ্চারিত হত, তখন আকস্মিকভাবে ধর্মীয় প্রতিনিধি ও গীর্জার পুরোহিতদের লোমহর্ষক জুলুম-নিপীড়নের

ভয়াবহ ছবি তাদের চোখে জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠত। উঠত সেসব নিরপরাধ জ্ঞানী-গুণী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের ছবি, যারা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ও অসহায় অবস্থায় ঐসব জল্লাদদের হাতে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণ করেছিল। ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর নামে ক্রোধব্যঞ্জক চেহারা, রুদ্র ও রুক্ষমূর্তি, অগ্নিঝরা চোখ ও সংকীর্ণ হৃদয়, পাদ্রীদের স্কুলমস্তিষ্ক তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠত। ফলে কেবল খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধেই নয় সকল ধর্মের প্রতি ভীতি ও ঘৃণাকে তারা জীবনের মূলনীতি বানিয়ে নেয়।"

গীর্জা, পুরোহিত ও ধর্মের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের আস্থা বিনষ্ট হয়। তাদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে- যাজকরা God Father, God Son. HolyGhost, আসমানী গ্রন্থ, আসমানী সাম্রাজ্যের কথা বলে তাদেরকে পরজগতের সুখ স্বপ্ন দেখায় অথচ তারা নিজেরা ইহজগতের যত ধরনের মজা আছে সব ভোগ করে। এবার তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। তারা God Father, God Son, Holy Ghost, আসমানী গ্রন্থ, আসমানী সাম্রাজ্য তথা পরজগৎ অন্যকথায় ধর্মকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে ইহজগতকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা আরম্ভ করে। 'এ জগতে কিভাবে মানুষের উন্নতি ও সম্পদের সমৃদ্ধি হয় এবং কিভাবে এ জগতেই সকল আশা-আকাংখা পরিপূরণ করা যায়'- এটাই হয় তাদের গবেষণার মুখ্য বিষয়। এ জাতীয় চিন্তাভাবনা ও গবেষণার ফসল হল সেকুলারিজম (Secularism).

সংক্ষেপে বলতে গেলে,সেকুলারিজম' এর আত্মপ্রকাশ

খৃস্টীয় পাশ্চাত্য সমাজ একসময় ধর্মীয় দোদুল্যতায় ভূগছিল, যা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের উর্বর ভূমি ও অনুকূল পরিবেশ, তখন সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ নামক বিষবৃক্ষটি জন্ম নেয় ও বেড়ে উঠে। ফ্রান্সে ঘটে যাওয়া প্রসিদ্ধ বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে সর্বপ্রথম ফ্রান্সই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের উপর রাষ্ট্রীয় কাঠামো দাঁড় করায়। এ মতবাদটি যদিও তার অভ্যন্তরে নাস্তিকতা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে দ্বীনকে দূরে সরিয়ে রাখা, এমনকি দ্বীনের সাথে শত্রুতা-বিদ্বেষ ও দ্বীন বিরোধিতা ইত্যাদি মারাত্মক চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড লালন করত, তারপরও তখনকার সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের আত্মপ্রকাশ ও তার অনুশীলন অনাকাঙ্ক্ষিত ও অদ্ভুত ছিল না, কারণ;

প্রথমত: সে-সময় তাদের ঈসায়ী দ্বীন আল্লাহর নিখাদ ওহী ভিত্তিক ছিল না, যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল ঈসা ইবনে মারয়াম 'আলাইহিস সালামের নিকট প্রেরণ করেছেন, বরং তাতে বিকৃতি ও মিথ্যার হাত অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছিল, তাই তাদের দ্বীন ছিল বিকৃত, পরিবর্তিত, বর্ধিত ও হ্রাসকৃত, যা মানব কল্যাণের বিপরীত অবস্থান নিয়েছিল। এখানেই শেষ নয়, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথেও তা ছিল সাংঘর্ষিক। সে-সময় ধর্মীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দানকারী গির্জাগুলো তাদের সন্ন্যাসী ও সংসারবিরাগীদের বিকৃতি ও পরিবর্তনকে শুধু সমর্থন নয়, দ্বীন

হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল, যা পালন করা ও যার উপর অটল থাকা তখন প্রত্যেকের উপর ফরয ছিল। বৈজ্ঞানিক ও গবেষকদের বিরুদ্ধে গির্জায় অভিযোগ করা হয়, ফলে গির্জা তাদেরকে শাস্তি দেয়, কারণ তারা বিকৃত দ্বীনের বিপরীত আবিষ্কার করেছে, তাদেরকে যিন্দিক ও নাস্তিক বলে অপবাদ দেয়, অতঃপর তাদের অনেককে করা হয়েছে হত্যা, আবার অনেককে দেওয়া হয়েছে জ্বালিয়ে এবং তাদের বহুসংখ্যককে করা হয়েছে জেলে বন্দি।

দ্বিতীয়ত -খৃস্টানদের ধর্মীয় মুখপাত্র- গির্জাগুলো অত্যাচারী বাদশাহদের সাথে অনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাদেরকে পবিত্র ও নিষ্পাপ সত্ত্বা হিসেবে আখ্যায়িত করে। তারা প্রজাদের উপর যে জুলম ও অত্যাচার করত, গির্জাগুলো সেগুলোর বৈধতা প্রদান করত। তাদের বিশ্বাস ছিল, এটাই প্রকৃত ধর্ম, যার শরণাপন্ন হওয়া ও যার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা সবার জন্য জরুরি।

তাই মানুষ গির্জার জেলখানা ও তার অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতির উপায় খুঁজে। তখন খৃস্টীয় দ্বীন থেকে বের হওয়া, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা, জীবন-ঘনিষ্ঠ সকল বিষয় যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও আদর্শ ইত্যাদি থেকে তাকে দূরে রাখা, বরং বিতাড়িত করা ব্যতীত মুক্তির কোনো উপায় ছিল না, কারণ তা জালেমদের পক্ষাবলম্বন ও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল।

হায়! তাদের জন্য কতই না ভালো হত, যদি তারা সেই বিকৃত খৃস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করত, কিন্তু তারা সে বিকৃত খৃস্টান ধর্মের উপর বিরক্ত হয়ে সকল দ্বীনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবেই সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে।
খৃস্টীয় পাশ্চাত্য সমাজে এ জাতীয় ঘটনার আত্মপ্রকাশ আশ্চর্য কোনো বিষয় নয়, তবে ইসলামে তার কোনো সুযোগ নেই, বরং কল্পনা করাও অসম্ভব। কারণ ইসলামে রয়েছে আল্লাহর ওহী, যার অগ্র-পশ্চাৎ কোনো দিক থেকে বাতিল অনুপ্রবেশ করতে পারে না। এ দ্বীন বিকৃতি ও পরিবর্তন মুক্ত, তাতে কোনো বিষয় বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস করা সম্ভব নয়, সে কাউকে পরোয়া করে না, হোক সে রাজা কিংবা প্রজা। সবাই তার শরীয়তের সামনে সমান। এ দ্বীন মানুষের প্রকৃত স্বার্থ সংরক্ষণকারী, এতে একটি বিধান নেই যা তাদের স্বার্থ পরিপন্থী। এ দ্বীন (ইসলাম) জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহ প্রদান করে। এতে প্রমাণিত এমন কোনো বিষয় নেই, যা বিজ্ঞানের প্রমাণিত বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক। অতএব দ্বীনে ইসলাম পুরোটাই সত্য, পুরো দ্বীনই কল্যাণ, পুরো দ্বীনই ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ থেকে আমরা বলতে পারি, পাশ্চাত্য সমাজে দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ ও অনীহা থেকে যে চিন্তা ও মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, ইসলামী দেশে

কখনো তা প্রকাশ পেত না, বরং মুসলিম দেশের কেউ তা শ্রবণও করত না, যদি না থাকত সংঘবদ্ধ স্নায়ুযুদ্ধ, যা ইসলামের নিষ্ক্রিয় ও নিষ্প্রভ হালতে ঈমান-শূন্য কতক অন্তর ও সুস্থ চিন্তা-শূন্য কিছু বিবেককে শিকার করতে সক্ষম হয়েছে।

মুসলিম দেশে বসবাসকারী খৃস্টানরাও বিভিন্ন মিডিয়া ও প্রচার-যন্ত্রের সাহায্যে সেকুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) মতবাদ আমদানি ও প্রসারের ক্ষেত্রে কম-যায়নি, তাদেরও রয়েছে বড় ভূমিকা ও ক্ষতিকর প্রভাব। অনুরূপ সেকুলারিজম প্রচারের ক্ষেত্রে মুসলিম শিক্ষানবিশরাও ভূমিকা রেখেছে প্রচুর, যারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের জন্য পাশ্চাত্য দেশসমূহে গিয়েছিল। সেখানে তারা বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ও তার আবিষ্কার দেখে ফেতনায় পতিত হয়, অতঃপর সে সকল দেশের প্রচলিত প্রথা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আচার-আচরণ বাস্তবায়ন ও প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে নিজ দেশে ফিরে আসে। অতঃপর এক শ্রেণির লোক সে সব (বিদেশ ফেরৎ তথাকথিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধ্বজাধারী) লোকদের পেশ করা এ সব তথ্য ও নীতিগুলো গ্রহণযোগ্য হিসেবে লুফে নেয়, তাদের ধারণা এরাই উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক-বাহক ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। বস্তুত এসব বিদেশ ফেরৎ লোকদের দেখা অভ্যাস, প্রথা ও পদ্ধতি যেগুলো তারা খুব বড় ও মহত চিন্তাধারা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে তা এমন সমাজের-যার সাথে দ্বীনের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই।

এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে আমরা মুসলিম দেশে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে জানতে পারলাম, যা আমাদেরকে আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করে:

এক. মুসলিম দেশে বাসকারী খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আমাদের জন্য ক্ষতিকর, তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাই তাদের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, আল্লাহ তাদেরকে যে স্থানে রাখতে বলেছেন আমরা তাদেরকে সেখানেই রাখব। তাদেরকে মুসলিম দেশে সামান্যতম কর্তৃত্ব ও পরামর্শ প্রদানের সুযোগ দেব না। সকল মিডিয়া, প্রচারযন্ত্র ও গণমাধ্যমগুলোর দরজা তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য উন্মুক্ত করে রাখব না, বরং বন্ধ করে রাখব, যেন তারা মুসলিমদের মাঝে তাদের বিষ ছড়ানোর সুযোগ না পায়। কিন্তু এ কাজ করবে কে! অধিকন্তু অনেক প্রতিষ্ঠান সেকুলারিজমের বিষ ছড়ানোর জন্য তাদেরকে বিভিন্ন পদ ও পদবী দিয়ে রেখেছে! আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, তিনিই আমাদের অভিভাবক।

দুই. শিক্ষানবিশদের বহির্বিশ্বে পাঠানোর ঝুঁকিও অনেক। তার পরিণতি ভয়াবহ। অনেক মুসলিম সন্তান এমন চেহারা ও অন্তর নিয়ে সেখান থেকে এসেছে যা নিয়ে সে সেখানে যায়নি। অতএব

বস্তুগত জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য সেখানে যাওয়া যখন ঝুঁকিপূর্ণ, তখন দ্বীনি ইলম শিখার জন্য সেখানে যাওয়া কিভাবে নিরাপদ, বিশেষ করে আরবি কিংবা ইসলামী বিষয়াদি শেখার জন্য?! আরবি কি আমাদের মুসলিমদের ভাষা, নাকি তাদের ভাষা?! কুরআনুল কারিম নাযিল হয়েছে আমাদের ভাষায়, না তাদের ভাষায়?[1]!

এটা কি কখনো সম্ভব বা যুক্তি সঙ্গত যে, একজন মুসলিম ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও শরীয়তের বিদ্যার্জন করবে এমন লোকদের থেকে, যারা কট্টর কাফের, ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণকারী?!

সেকুলারিজমের সংজ্ঞা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। এবার সেকুলারিজমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হচ্ছে:
The New Encyclopedia Britanica এর ২০০৩ সালের সংস্করণের দশম Volume এ ৪৯৪ পৃষ্ঠায় সেকুলারিজম সম্পর্কে বলা হয়:

"পরকাল বাদ দিয়ে ইহজগতকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনাকে মূলধন করে পরিচালিত হয় সেকুলারিজমের আন্দোলন। ইতিপূর্বে মধ্যযুগে মানবিক বিষয়গুলো বাদ দিয়ে ঈশ্বর ও পরজগতকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা ও গবেষণা প্রাধান্য পেত। মধ্যযুগের এ জাতীয় চিন্তাভাবনার প্রতিক্রিয়া (Reaction) হিসাবে রেনেসাঁ যুগে মানবিকতার উন্নতি সাধন, মানুষের সাংস্কৃতিক অর্জন ও এ জগতেই তার আশা আকাংখার প্রতিফলন দেখার ব্যাপারে মানুষ অধিকতর মনোযোগী হয়। এর ফলশ্রুতিতে সেকুলারিজমের উদ্ভব হয়। সেকুলারিজমের আন্দোলন আধুনিক যুগে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে।সেকুলারিজমের এ আন্দোলন খ্রিস্টধর্ম ও ধর্মবিরোধী আন্দোলন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।"

সেকুলারিজমের আন্দোলনকে বেগবান করতে আধুনিক যুগের যে সকল বুদ্ধিজীবী কলম ধরেন তাদের কয়েকজনের বক্তব্য নিম্নে প্রদান করা হল:

ইংল্যান্ডের National Secular Society এর-সভাপতি Mr. Charles Bradlaugh তার Autobiography বইয়ে লিখেন :-
"সেকুলারিজম ও আস্তিকতা পাশাপাশি চলতে পারে না। তাই আস্তি কতাবাদী বিশ্বাসের সাথে লড়াই করা সেকুলারিজমের জন্য অপরিহার্য।
অদৃশ্য বিশ্বাস ও মানব প্রগতি পাশাপাশি চলতে পারে না।

ধর্মীয় বিশ্বাস প্রতিহত করাই সেকুলারিজমের কর্তব্য। কেননা এসব কুসংস্কারমূলক ধারণা, বিশ্বাস যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিতে বিরাজমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত বস্তুগত উন্নতি লাভ কল্পনাতীত হয়ে থাকবে।

ধর্ম অজানা জগত নিয়ে কথা বলে। ফলে ইহকালীন বিষয়ে ধর্মের কোন স্থান নাই, যেমন পরজগতের ব্যাপারে সেকুলারিজমের কোন বক্তব্য নাই।"

* Jeferson বলেন:

"সেকুলারিজম গীর্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি দেয়াল নির্মাণ করতে চায়।"

* John Stuart Mill বলেন:

"ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে মানুষকে অন্য কারো কাছে দায়ী হতে হবে- আমি এ ধারণাকে দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করি।"

* খ্রিস্ট সমাজের মধ্যে Deist নামক একটি গ্রুপের মতামত হল:

"সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন-যিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন, কিন্তু মানব জাতির পার্থিব জীবন পরিচালনায় তার কোন ভূমিকা বা নির্দেশনা নাই।"

একটি বইতে সেকুলারিজমের ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে :-

অর্থাৎ সেকুলারিজম ধর্ম থেকে পৃথক। ধর্মের উপর নির্ভরশীল নয়। ধর্মের অধীন নয়। ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

একজন সেকুলার ব্যক্তি কোন ধর্মের উপর বিশ্বাসী নন।

সেকুলারিজম এমন এক রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন:

১। যা মানব রচিত একটি মতবাদ।

২। যার আওতা (scope) ইহজগত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

৩। যা মানুষ ছাড়া বাইরের কোন শক্তির নিকট থেকে জ্ঞান আহরণের প্রয়োজন মনে করে না।

৪। এর আওতাধীন বিষয়গুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইহজগতেই সম্ভব।

৫। মানবীয় সকল আশা-আকাঙ্খা পরিপূরণ হতে হবে এ জগতে।

৬। অদৃশ্য বিশ্বাস ও মানব প্রগতি এক সাথে চলতে পারে না।

৭। ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস কুসংস্কারমূলক এবং বস্তুগত উন্নতির প্রতিবন্ধক।

৮। মানুষ কেবল মানুষ ছাড়া অন্য কোন শক্তির নিকট দায়ী নয়।

অতএব স্বত:স্ফূর্তভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সেকুলারিজম ধর্মের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান:

আল্লাহ্

আখিরাত

পুনরুত্থান

শেষ বিচার

জান্নাত- জাহান্নাম

ফিরিশতা

ওহি

নবুয়্যাত

আসমানী কিতাব

এর উপর এক কথায় ধর্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না।

সেকুলারিজমের দু'টি রূপ রয়েছে। যার একটি অপরটি থেকে জঘন্য:

প্রথম রূপ: সরাসরি নাস্তিকতা:

এ প্রকার সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) দ্বীনকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তা ধর্মীয় কোনো বিষয় স্বীকার করে না, বরং যারা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমানের দাওয়াত দেয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ জাতীয় সেকুলারিজমের (ধর্মনিরপেক্ষতার) অনুসারীরা নিজেদের কুফরি, অশ্লীলতা ও কুকর্মে আত্মগর্বী ও অহংকারী। তাদের কুফরির ফয়সালা করা সকল মুসলিমের পক্ষে সহজ। আলহামদুলিল্লাহ তাদের বিষয়টি মুসলিমদের নিকট স্পষ্ট। কোনো মুসলিম তাদের দিকে ধাবিত হয় না, তবে যে দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় সে ব্যতীত। এ ধরনের সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) জনসাধারণের নিকট কম বিপজ্জনক, তারা সাধারণ মানুষকে সহসা ধোঁকায় ফেলতে সক্ষম নয়, তবে দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, মুমিনদের সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া, অথবা জেল দেওয়া অথবা হত্যা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারাও কম ক্ষতিকর নয়।

দ্বিতীয় রূপ: পরোক্ষ নাস্তিকতা

এ প্রকার নাস্তিকতা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না, তাত্ত্বিকভাবে তার উপর ঈমান আনে, তবে দুনিয়ার কোনো বিষয়ে দ্বীনের কর্তৃত্ব মানে না। তাদের শ্লোগান দুনিয়াকে দ্বীন

থেকে পৃথক কর। জনসাধারণকে ধোঁকায় ফেলা ও বিপথগামী করার ক্ষেত্রে এ প্রকার নাস্তিকতা বা সেকুলারিজম (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা) অপেক্ষাকৃত বেশি বিপজ্জনক। কারণ তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার ও তার দ্বীনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে না, তাই তাদের কুফরির প্রকৃত অবস্থা অনেক মুসলিমের নিকট প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট থাকে। দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও পর্যাপ্ত ইলম না থাকার কারণে তারা সেকুলারিজমকে (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে) কুফরি বলে মনে করে না। এ কারণে মুসলিম দেশসমূহের অধিকাংশ সরকার সেকুলার (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ) মতবাদের অনুসারী। অনেক, বরং অধিকাংশ মুসলিম তাদের হাকিকত জানে না।

এ প্রকার সেকুলারিজমের (ধর্মনিরপেক্ষতার) অনুসারী সংগঠনগুলো দ্বীন ও দ্বীনের দাওয়াত প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেও নিশ্চিত থাকে, কেউ তাদের কাফের ও দ্বীন থেকে খারিজ বলবে না। কারণ, তারা প্রথম প্রকারের ন্যায় প্রকাশ্য নাস্তিকতাসহ আত্মপ্রকাশ করেনি। তাদের কাফের না বলা মুসলিমদের মূর্খতার প্রমাণ। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি আমাদেরকে ও সকল মুসলিমকে সঠিক জ্ঞান দান করুন। মুসলিম উম্মতকে দ্বীন বুঝার তৌফিক দিন, তারা যেন এসব সংস্থা ও সংগঠন থেকে আত্মরক্ষা গ্রহণ করে।

অতএব দ্বীন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কোনো মুসলিম সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বীদের কথা বা লেখনীতে আল্লাহর নাম অথবা রাসূলের নাম অথবা ইসলামের নাম শুনে বা দেখে আশ্চর্য হয় না[3], বরং তারাই আশ্চর্য হয় ও বিস্ময় প্রকাশ করে, যারা তাদের প্রকৃত অবস্থা জানে না।

মোদ্দাকথা:

উভয় প্রকার সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) স্পষ্ট কুফরি, এতে কোনো সন্দেহ ও সংশয় নেই। যদি কেউ উল্লেখিত কোনো প্রকার ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ মনেপ্রাণে মেনে নেয়, সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত ও মুরতাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন। কারণ, ইসলামই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা জীবন বিধান, মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার স্পষ্ট বিধান রয়েছে, হোক তা আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চারিত্রিক বা সামাজিক কোনো শাখা। ইসলাম কখনো কোনো মতবাদকে তার বিধানে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয় না। ইসলামের সকল শাখায় পরিপূর্ণরূপে প্রত্যেক মুসলিমের প্রবেশ করা ফরয। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ ٢٠٨ ﴾ [البقرة: ٢٠٨]

“হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর”।

কুরআনুল কারিমের কতক বিধান গ্রহণ করে কতক বিধান ত্যাগকারীকে আল্লাহ তা‘আলা কাফের বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ٨٥ ﴾ [البقرة: ٨٥]

“তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফেল নন”।

ইসলামে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয় যে প্রত্যাখ্যান করল, সে কাফের ও পথভ্রষ্ট, যদিও তার প্রত্যাখ্যান করা বিষয়ের পরিমাণ খুবকম ও সামান্য হয়। অতএব পার্থিব রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ইসলামের সকল বিধান যে প্রত্যাখ্যান করে, সে কাফের বলার অপেক্ষা রাখে না, যেমন সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীরা।

দ্বিতীয়ত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদের মাঝে ইসলাম বিনষ্টকারী কারণও রয়েছে, যেমন তারা বিশ্বাস করে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ থেকে অন্য কারও আদর্শ উত্তম, অনুরূপ তার ফয়সালা থেকে অন্য কারও বিচার-ফয়সালা উত্তম। এ কারণেও তারা কাফের।

শায়খ আব্দুল আযীয ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “ইসলাম বিনষ্টকারী চতুর্থ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত ঐ ব্যক্তি, যে বিশ্বাস করল মানুষের তৈরি আইনি সংস্থাগুলো ইসলামী শরীয়তের বিধান থেকে উত্তম, অথবা বিশ্বাস করল যে, বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করা যুক্তিসঙ্গত নয়, অথবা ইসলাম প্রগতির অন্তরায়, অথবা বলল ইসলাম শুধু ব্যক্তি ও তার রবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, মানুষের জীবনের অন্য কোনো অংশে প্রবেশ করার অধিকার ইসলামের নেই”

সেকুলারিজমের পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক আন্দোলন:

সেকুলারিজমের নামকরণ ও সত্ত্বার দিক দিয়ে প্রধান ব্যক্তি হলেন George Jacob Holyoake. ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে তার জন্ম এবং ১৯০৫ সালে তার মৃত্যু হয়। তিনি ১৫ বছর বয়সে Chartism নামক সংস্কার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৪১ সালে তিনি দৃঢ়তার সাথে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করেন। এ কারণে ব্লাসফেমী আইনে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং 'ক্যালটেনহামে' কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। গ্রেফতারের পর খ্রিস্টধর্মের প্রতি তার ঘৃণা অধিকতর গভীর তীব্র ও প্রচণ্ড হয়ে উঠে। জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি "Reasoner" নামক পত্রিকায় লিখেন-"আমরা সকলে খ্রিস্টধর্মের ভ্রান্তিমূলক রীতিনীতি প্রত্যাখ্যান করছি।" ১৮৪৯ সালে তিনি Secular Society গঠন করে সেকুলারিজমের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮৬৬ সালে এ সোসাইটিতে যোগদান করেন Charles Bradlaugh. এ সময় এ সোসাইটির নামকরণ করা হয় National Secular Society. Mr. Charles Bradlaugh এ সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। Mr. Charles Bradlaugh ১৮৮০ সালে বিলাতের Northampton আসন থেকে M.P নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি ধর্মীয় কায়দায় শপথ নিতে অস্বীকার করায় তার আসন খালি হয়ে যায়। দুই বছর পর শপথ নেবার এ পদ্ধতি পরিবর্তন হয়। তারপর তিনি একই আসন থেকে ৪ বার M.P. নির্বাচিত হন। উক্ত National Secular Society জনমত সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে এবং রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ প্রভাবিত করে। তাছাড়া এ সংগঠন পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।

ফ্রান্সে সেকুলারিজম :

ফ্রান্সে Secularism এর পরিবর্তে যে পরিভাষাটি ব্যবহার হয় তার নাম Laicism. এর অর্থ হল 'অধর্মীয় ব্যবস্থা'। রাষ্ট্র, সমাজ, আইন ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি থেকে গীর্জার কর্তৃত্বমুক্ত করার জন্য Laicism আন্দোলন গড়ে উঠে। ১৯০৪-০৫ সালে এ আন্দোলন সফলতা অর্জন কর। ১৯০৪ সালে রাষ্ট্রীয় আইন করে পোপের বিচারিক ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হয়। এ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে গীর্জায় অনুদান প্রদান করা নিষিদ্ধ হয়। পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও স্থানগুলো থেকে সকল প্রকার ধর্মীয় প্রচারণামূলক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

সেকুলারিজম সম্পূর্ণ একটি পাশ্চাত্য মতবাদ:

জাপান থেকে আরম্ভ করে ভারত, মধ্যএশিয়া, মক্কা, মদিনা, ফিলিস্তিন ও কায়রো পর্যন্ত বহু সভ্যতার উত্থান-পতন হয়েছে। এ এলাকা সমূহে বহু নবীর আগমন হয়েছে। ইতিহাসে কোথাও

ধর্মের সাথে বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক কিংবা রাজনীতিবিদদের সাথে এমন সংঘাত যা পাশ্চাত্যে ঘটেছে, প্রাচ্যে তার নজির নাই।

সেকুলাজিমের তিনটি বাংলা অনুবাদ হতে পারে। যথা:

১। ইহজাগতিকতাবাদ
২। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ
৩। ধর্মহীন মতবাদ।

১। ইহজাগতিকতাবাদ:

এটাই সেকুলারিজমের সঠিক অনুবাদ। Secularism ল্যাটিন শব্দ Saeculum শব্দ থেকে উদ্ভব হয়েছে। Saeculum শব্দের অর্থ ইহজগত। এ মতবাদের সমস্ত চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপ ইহজগতকেন্দ্রিক। সুতরাং Secularism এর সঠিক অনুবাদ হবে ইহজাগতিকতাবাদ।

২। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ:

এটি Secularism এর সঠিক বাংলা অনুবাদ নয়। তবে সমাজে এ অনুবাদ প্রচলিত হয়ে গেছে। ধর্ম ইহজগত ও পরজগত উভয় জগতকে স্বীকার করে। কিন্তু সেকুলারিজম কেবলমাত্র ইহজগত স্বীকার করে আর পরজগতকে করে অস্বীকার। তবে Secularism is fully independent of religious ideas and religion অর্থাৎ ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক (Independent) মতবাদের নাম হল Secularism. এ অর্থে এর অনুবাদ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ চলতে পারে।

যে ব্যক্তি চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায় ও কার্যকলাপে ধর্মের পক্ষে অবস্থান করল, সে হল ধর্মের পক্ষের লোক। আর যে লোক কোন ধর্মের পক্ষে অবস্থান করল না- সে হল ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি।

৩। ধর্মহীন মতবাদ:

যেহেতু ধর্মের প্রতি এ মতবাদের আস্থা নাই- তাই এ মতবাদ হল ধর্মহীন মতবাদ বলে গ্রহণ করার পর যথাযথ স্থানে ধর্মকে রাখতে হবে। ধর্মকে তার নিজস্ব স্থান থেকে টেনে নীচে নামানো যাবে না, উপরেও তোলা যাবে না, অন্য কোথাও টেনে আনা যাবে না। বরং আমি যদি পবিত্র ধর্ম ইসলামের কোন দিক ও বিভাগের বাইরে অবস্থান করি, কিংবা আমার কোন

কার্যকলাপ ধর্মের আওতা বহির্ভূত হয়, তাহলে আমার সম্পূর্ণ সত্ত্বা ও কর্মকান্ডকে টেনে এনে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করাতে হবে। অন্যথায় আমার কি পরিণতি হবে তা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

সেক্যুলারিজমের ভ্রষ্ট ব্যাখ্যা ও ইসলামের সাথে সংঘর্ষ

সেকুলারিজমের দু'টি রূপ রয়েছে। যার একটি অপরটি থেকে জঘন্য:

প্রথম রূপ: সরাসরি নাস্তিকতা: এ প্রকার সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) দ্বীনকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তা ধর্মীয় কোনো বিষয় স্বীকার করে না, বরং যারা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমানের দাওয়াত দেয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ জাতীয় সেকুলারিজমের (ধর্মনিরপেক্ষতার) অনুসারীরা নিজেদের কুফরি, অশ্লীলতা ও কুকর্মে আত্মগর্বী ও অহংকারী। তাদের কুফরির ফয়সালা করা সকল মুসলিমের পক্ষে সহজ। আলহামদুলিল্লাহ তাদের বিষয়টি মুসলিমদের নিকট স্পষ্ট। কোনো মুসলিম তাদের দিকে ধাবিত হয় না, তবে যে দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় সে ব্যতীত। এ ধরনের সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) জনসাধারণের নিকট কম বিপজ্জনক, তারা সাধারণ মানুষকে সহসা ধোঁকায় ফেলতে সক্ষম নয়, তবে দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, মুমিনদের সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া, অথবা জেল দেওয়া অথবা হত্যা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারাও কম ক্ষতিকর নয়।

দ্বিতীয় রূপ: পরোক্ষ নাস্তিকতা[1]:

এ প্রকার নাস্তিকতা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না, তাত্ত্বিকভাবে তার উপর ঈমান আনে, তবে দুনিয়ার কোনো বিষয়ে দ্বীনের কর্তৃত্ব মানে না। তাদের শ্লোগান দুনিয়াকে দ্বীন থেকে পৃথক কর। জনসাধারণকে ধোঁকায় ফেলা ও বিপথগামী করার ক্ষেত্রে এ প্রকার নাস্তিকতা বা সেকুলারিজম (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা) অপেক্ষাকৃত বেশি বিপজ্জনক। কারণ তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার ও তার দ্বীনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে না, তাই তাদের কুফরির প্রকৃত অবস্থা অনেক মুসলিমের নিকট প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট থাকে।[2] দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও পর্যাপ্ত ইলম না থাকার কারণে তারা সেকুলারিজমকে (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে) কুফরি বলে মনে করে না। এ কারণে মুসলিম দেশসমূহের অধিকাংশ সরকার সেকুলার (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ) মতবাদের অনুসারী। অনেক, বরং অধিকাংশ মুসলিম তাদের হাকিকত জানে না।

এ প্রকার সেকুলারিজমের (ধর্মনিরপেক্ষতার) অনুসারী সংগঠনগুলো দ্বীন ও দ্বীনের দাওয়াত প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেও নিশ্চিত থাকে, কেউ তাদের কাফের ও দ্বীন থেকে খারিজ বলবে না। কারণ, তারা প্রথম প্রকারের ন্যায় প্রকাশ্য নাস্তিকতাসহ আত্মপ্রকাশ করেনি। তাদের কাফের না বলা মুসলিমদের মূর্খতার প্রমাণ। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি আমাদেরকে ও সকল মুসলিমকে সঠিক জ্ঞান দান করুন। মুসলিম উম্মতকে দ্বীন বুঝার তৌফিক দিন, তারা যেন এসব সংস্থা ও সংগঠন থেকে আত্মরক্ষা গ্রহণ করে।

অতএব দ্বীন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কোনো মুসলিম সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বীদের কথা বা লেখনীতে আল্লাহর নাম অথবা রাসূলের নাম অথবা ইসলামের নাম শুনে বা দেখে আশ্চর্য হয় না[3], বরং তারাই আশ্চর্য হয় ও বিস্ময় প্রকাশ করে, যারা তাদের প্রকৃত অবস্থা জানে না।

মোদ্দাকথা:

উভয় প্রকার সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) স্পষ্ট কুফরি, এতে কোনো সন্দেহ ও সংশয় নেই। যদি কেউ উল্লেখিত কোনো প্রকার ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ মনেপ্রাণে মেনে নেয়, সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত ও মুরতাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন। কারণ, ইসলামই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা জীবন বিধান, মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার স্পষ্ট বিধান রয়েছে, হোক তা আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চারিত্রিক বা সামাজিক কোনো শাখা। ইসলাম কখনো কোনো মতবাদকে তার বিধানে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয় না। ইসলামের সকল শাখায় পরিপূর্ণরূপে প্রত্যেক মুসলিমের প্রবেশ করা ফরয। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ ٢٠٨ ﴾ [البقرة: ٢٠٨]

“হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর”।[4]

কুরআনুল কারিমের কতক বিধান গ্রহণ করে কতক বিধান ত্যাগকারীকে আল্লাহ তা'আলা কাফের বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ٨٥ ﴾ [البقرة: ٨٥]

“তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফেল নন”।[5]

ইসলামে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয় যে প্রত্যাখ্যান করল, সে কাফের ও পথভ্রষ্ট, যদিও তার প্রত্যাখ্যান করা বিষয়ের পরিমাণ খুবকম ও সামান্য হয়। অতএব পার্থিব রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ইসলামের সকল বিধান যে প্রত্যাখ্যান করে, সে কাফের বলার অপেক্ষা রাখে না, যেমন সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীরা।

দ্বিতীয়ত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদের মাঝে ইসলাম বিনষ্টকারী কারণও রয়েছে, যেমন তারা বিশ্বাস করে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ থেকে অন্য কারও আদর্শ উত্তম, অনুরূপ তার ফয়সালা থেকে অন্য কারও বিচার-ফয়সালা উত্তম। এ কারণেও তারা কাফের।[6]

শায়খ আব্দুল আযীয ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “ইসলাম বিনষ্টকারী চতুর্থ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত ঐ ব্যক্তি, যে বিশ্বাস করল মানুষের তৈরি আইনি সংস্থাগুলো ইসলামী শরীয়তের বিধান থেকে উত্তম, অথবা বিশ্বাস করল যে, বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করা যুক্তিসঙ্গত নয়, অথবা ইসলাম প্রগতির অন্তরায়, অথবা বলল ইসলাম শুধু ব্যক্তি ও তার রবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, মানুষের জীবনের অন্য কোনো অংশে প্রবেশ করার অধিকার ইসলামের নেই”

সেক্যুলারদের কিছু উদ্ভট যুক্তি ও তার জবাবঃ

- ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার অর্থাৎ জনগণের

এ বক্তব্যের দুটো অংশ:

(ক) ধর্ম যার যার

(খ) রাষ্ট্র সবার অর্থাৎ জনগণের।

(খ) অংশের আলোচনা: রাষ্ট্র সবার অর্থাৎ জনগণের

রাষ্ট্র তথা দেশ বলতে নির্দিষ্ট ভূখন্ড, তার ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ, জলজ সম্পদ, ভূপৃষ্ঠস্থ সম্পদ ও ভূ-উপরস্থ সম্পদ এবং সমুদ্রসীমা থাকলে উপকূলস্থ সম্পদ ইত্যাদি বুঝায়। দেশ তথা রাষ্ট্র জনগণের হলে রাষ্ট্রের সম্পদেরও মালিক জনগণ। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে আমিও রাষ্ট্রের সম্পদের একজন মালিক। হতে পারি পনের কোটি ভাগের এক ভাগের মালিক।

অন্যান্য সম্পদের কথা বাদ দিলাম। খনিজ সম্পদের উপর আমার দাবী উত্থাপন করছি। এ পর্যন্ত কোটি কোটি টাকার খনিজ সম্পদ আহরণ করা হয়েছে। এ সম্পদের কমপক্ষে পনের কোটি ভাগের এক ভাগের মালিক আমি। আমি আমার অংশ আজ পর্যন্ত বুঝে পাই নাই। খনিজ সম্পদের টাকা যাদের কর্তৃত্বে আছে তারা ভবিষ্যতে আমাকে আমার অংশ বুঝিয়ে দিবেন এমন আলামত দেখছি না। যদি আমি আমার অংশের জন্য মামলা করি এবং শেষ পর্যন্ত সুপ্রীমকোর্টে যাই, সে কোর্টও আমার অংশ বুঝিয়ে দেবে-এমন সম্ভাবনা দেখছি না। কারণ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণও তাদের অংশ বুঝে পান নাই।

অবস্থা যদি তাই হয় তাহলে আমি মালিক হলাম কিভাবে? কোন যুক্তিতে? তাহলে জনগণ দেশ ও রাষ্ট্রের সম্পদের মালিক হল কোন দলিলের ভিত্তিতে? কোন নৈতিক অধিকারে? বাস্তবেই যদি জনগণ মালিক হত তাহলে প্রত্যেকে তার অংশ অবশ্যই বুঝে পেত।
প্রকৃত সত্য হল- দেশ ও দেশের খনিজ, বনজ, জলজ ইত্যাদি কোন সম্পদের মালিক জনগণ নয়। দেশের এক খন্ড মাটি, মাটির গুণাগুন, একটি মাছ, একটি গাছ, একটি পশু, একটি পাখি, বাতাসের সামান্য অক্সিজেন, একটি বৃষ্টির ফোঁটা, নদী-নালার পানি ইত্যাদি কোন কিছু মানুষ সৃষ্টি করে নাই। এসব কিছুর স্রষ্টা হলেন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তিনিই সব কিছুর মালিক। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। 'লিল্লাহি মা ফিস্ সামাওয়াতি ওমা ফিল আরদ।'

"আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহর।"

(সূরা বাকারা, আয়াত-২৮৪)

আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তিনিই মালিক সেসব জিনিসের যা আসমান ও জমিনের আছে। আর যা আছে আসমান ও জমিনের মাঝখানে এবং মাটির গর্ভে। (সূরা ত্বাহা, আয়াত-৬)

আল্লাহ মানবজাতিকে তাঁর খলিফা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। 'ইন্নি জা-ঈ-লুন ফিল আরদি খলিফা।' তিনি মানুষের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন (তিনিই সে সত্ত্বা যিনি হে মানুষ তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন) (সূরা বাকারা আয়াত-২৯)।

সুতরাং জনগণ সবকিছুর মালিক নয়। তবে মানুষ হোক সে হিন্দু বা মুসলমান, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান, সাদা বা কালো, নারী কিংবা পুরুষ সবই আল্লাহর খলীফা, তাঁর প্রতিনিধি এবং সবকিছুর ভোগাধিকারী। সবকিছু মানুষের খেদমত করবে, মানুষ সব কিছু ভোগ করবে যেহেতু সে সৃষ্টিকর্তার খলিফা, তাঁর প্রতিনিধি। আর মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর মালিকানাধীন সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছামত ব্যবহার করবে। সে যেহেতু কোন কিছুর মালিক নয়, কোন কিছু তার মালিকানাধীন নয় সুতরাং তার নিজের position, নিজের মর্যাদা নিজেকে উপলব্ধি করতে হবে। সে মালিকের ইচ্ছার বাইরে নিজের ইচ্ছা বা আইন প্রয়োগ করে কোনো কিছু করলে সে হবে স্বেচ্ছাচারী, মালিককে অস্বীকারকারী, আমানতের খেয়ানতকারী, জুলুমবাজ, অকৃতজ্ঞ ও নিমক হারাম।

মানুষকে অনুভব করতে হবে আমি সৃষ্টির সেরা, সবকিছু আমার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আমার মর্যাদা সবার উপরে কারণ সৃষ্টিকর্তা আমাকে তাঁর নিজের প্রতিনিধির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে সবকিছুর উপর তার ইচ্ছা কার্যকর করার দায়িত্ব প্রদান করেছেন। ঐ উপলব্ধি যার মধ্যে আসবে সে মর্যাদার উচ্চ আসনে সমাসীন হতে পারবে, হতে পারবে আমানতের হেফাযতকারী, স্বীয় কর্তব্য সঠিকভাবে পালনকারী, সত্যের সাধক, সফলকাম ব্যক্তি, সত্যিকার কল্যাণকামী, বিশ্বস্ত ও কৃতজ্ঞ।

অতএব দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তি-হোন তিনি কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী, সংস্থা প্রধান, সমাজ প্রধান, সরকার কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান তাকে এ অনুভূতি নিয়ে কাজ করতে হবে- 'আমি সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি।' আমাকে সৃষ্টিকর্তা বিরাট সুযোগ প্রদান করেছেন, আমার উপর কর্তব্যের বোঝা বিরাট। আমাকে স্বেচ্ছাচারী হলে চলবে না, আমানতের খেয়ানত করা যাবে না। মালিককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমাকে সব কাজ সম্পাদন করতে হবে।

*

(ক) অংশের আলোচনা: ধর্ম যার যার:

উপরের কথা স্বীকার করে নিলে সেকুলারিজমের পক্ষে ওকালতি করার কোন যুক্তি, কোন নৈতিক অধিকার থাকে না। কারণ 'ধর্ম যার যার'- বলে ধর্ম স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। ধর্মের অত্যাবশ্যক উপাদানগুলো হল-ইহজগত, পরজগত, শেষবিচার, স্বর্গ-নরক, নবী, ধর্মগ্রন্থ, সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি।

সেকুলার আদর্শ ইহজগত ছাড়া ধর্মের একটি উপাদানও বিশ্বাস করে না। সুতরাং সেকুলারিজম ও ধর্ম বিশ্বাসের সহাবস্থান হয় না।

* সেকুলাররা উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষকে ধারণা দিতে চায় যে, যেহেতু দেশের মধ্যে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা আছে, সুতরাং দেশ কোন ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে না গিয়ে সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো সেকুলারদের হাতে ছেড়ে দেয়া হোক। সেকুলাররা রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও সরকারী কর্মকান্ড পরিচালনা করুক। তারা অতি চালাক সেজে ধার্মিক লোকদের বোকা বানিয়ে রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব ও সরকারী কর্মকান্ড থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে নিজেদের হাতে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে চায়।

* নিজের ধর্মের সব বিষয়ে জ্ঞান রাখে এমন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এক বিষয়ে সবাই একমত যে তারা সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি। সৃষ্টিকর্তা সব মানুষকে প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। দায়িত্বশীল সব নাগরিক চায় হিন্দুরা ভাল হিন্দু হোক, মুসলমানরা ভালো মুসলমান হোক, বৌদ্ধরা ভালো বৌদ্ধ হোক, খ্রিস্টানরা ভালো খ্রিস্টান হোক। দেশ পরিচালনা এবং রাষ্ট্রের হিত কামনা করা প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অতএব সব ধর্মের লোকেরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আইনসভায় যাবে। আইনসভা সরকার গঠন করবে। ধার্মিক নাগরিকেরা রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তারা রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। অতএব সরকারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হবে দেশের নাগরিক হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সবাইকে ধার্মিক ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। সরকার রাষ্ট্রকে কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলবে এবং ধর্ম, বর্ণ, গোত্র অঞ্চল নির্বিশেষে সবার কল্যাণ নিশ্চিত করবে।

আইনসভা সৃষ্টিকর্তার আইনের স্বীকৃতি দিবে। যে সব ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার সুস্পষ্ট বিধি-বিধান নেই, সেসব ক্ষেত্রসমূহে আইন ও বিধি-বিধান রচনা করবে। আইন রচনা করার সময়

সাবধানতা অবলম্বন করা হবে যাতে কোন আইন ও বিধি-বিধান স্রষ্টার আইনের পরিপন্থী না হয়।

অতএব সেকুলারদের কথা সমর্থন করে বলা যায় যে, 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' সেকুলারিজমের পক্ষে কোন যুক্তি নয়।

(৩) মানব ধর্ম আসল ধর্ম অন্যান্য ধর্ম সাম্প্রদায়িক

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়:

মানব ধর্ম যদি আসল ধর্ম হয় তবে অনুসন্ধান করে জানতে হবে এ ধর্মের উপাদান কি কি?

সবাই জানে ধর্মের অত্যাবশ্যক উপাদান হল-স্রষ্টা, সৃষ্টি, নবী-রসুল, ধর্মগ্রন্থ, পুনরুত্থান, শেষ বিচার, স্বর্গ, নরক, পূজা-উপাসনা-ইবাদত, পূজারী, যার উদ্দেশ্যে পূজা প্রদান করা হয় (মাবুদ) ইত্যাদি। মানবধর্মে এ সমস্ত উপাদান আছে কি?
যদি না থাকে তবে এটা ধর্ম পদবাচ্য হল কবে? কার মাধ্যমে? কিভাবে?
বলা হয় মানবধর্মের রচয়িতা মানুষ। সবাই জানে মানুষ যা রচনা করে তা মতবাদ (ism) হয়, ধর্ম হয় না। তারপরও যদি জোর খাটিয়ে বলা হয় মানবধর্ম আসল ধর্ম তাহলে কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যার জবাব পাওয়া দরকার।
মানবধর্মের রচয়িতা-

কোন মানুষ?
কোন শ্রেণীর মানুষ?
কোন দেশের মানুষ?
কোন কালের মানুষ?
কোন বর্ণের মানুষ?
তিনি কি সবজান্তা?
তিনি কি ভুলের উর্ধ্বে?
তিনি কি স্বার্থের উর্ধ্বে?
তিনি কি কালের উর্ধ্বে?
কবে এ ধর্মের আবির্ভাব হল? কাদের উপর এ ধর্ম প্রযোজ্য হবে?

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনযাপনের প্রয়োজনে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ ধর্মে মানুষের সব সমস্যার সমাধান আছে কি?
এ ধর্মে চিরসত্য বলে কিছু আছে? না সত্য আপেক্ষিক?
এ ধর্ম আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে, না নিশ্চিত কোন জ্ঞানের সাহায্যে রচিত হয়েছে? যদি নিশ্চিত কোন জ্ঞানের সাহায্যে রচিত হয়ে থাকে তবে সে জ্ঞানের উৎস কি? মানবধর্মে মানবের পরিসমাপ্তি ইহজগতে শেষ? না আর কোন জগত আছে?
মানবধর্ম রচয়িতাকে যদি প্রশ্ন করা হয়- 'আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ, তাহলে আপনি কোন অধিকারবলে আপনার রচিত ধর্ম আমার উপর চাপিয়ে দিতে চান?' এর জবাব কি হবে?
এ সমস্ত জবাব পাওয়ার পরই কেবল মানবধর্ম বিবেচনার যোগ্য হতে পারে।

(৪) ইসলাম সাম্প্রদায়িক ধর্ম
ইসলাম ধর্মের উপর সেকুলাররা অভিযোগ উত্থাপন করে যে, ইসলাম একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম।

সেকুলারদের এ অভিযোগ সঠিক নয় কারণ:-
ইসলাম কোন মানুষের রচিত ধর্ম নয়। এ ধর্ম সমগ্র বিশ্বজগত ও সৃষ্টিকূলের স্রষ্টা মহান আল্লাহতায়ালা নাযিল করেছেন। এ ধর্মে কাঁচি লাগানো কিংবা
যিনি এ ধর্ম রচনা করেছেন-
সুই সুতার মাধ্যমে কোন কিছু সংযোজন করার অধিকার কোন মানুষের নাই। ইহজগতের সর্বস্বীকৃত শ্রেষ্ঠতম মানুষ, সর্বশেষ নবী ও রসুল হযরত মুহাম্মদ (স.) যার উপর আসমানী কিতাব আল কুরআন নাযিল হয়েছে-তাঁর নিজেরও ধর্মে কোনকিছু সংযোজন কিংবা বিয়োজন করার কোন অধিকার ছিল না।

মহান আল্লাহতায়ালা বলেন- "এই নবী যদি কোন কথা রচনা করে আমার নামে চালিয়ে দিত, তাহলে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠশিরা ছিন্ন করে ফেলতাম।" (সূরা: হাক্কাহ, আয়াত-৪৪, ৪৫ ও ৪৬)

আল্লাহ মানুষের সৃষ্টিকর্তা। মানুষ আল্লাহর খলিফা তথা প্রতিনিধি। সৃষ্টির প্রতি তাঁর কোন বৈষম্য নাই। তাঁর সৃষ্ট বাতাস, পানি, মাটি, আগুন, সূর্যের আলো, চাঁদের জোছনা, বৃষ্টির পানি, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফল ফসল, গাছ, মাছ, পশু-পাখি ইত্যাদি কোন সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নয়, কোন কালের জন্য নয়, কোন এলাকার জন্য নয়, এগুলো সর্বকালের, সব এলাকার, সব মানুষের জন্য।

অতএব আল্লাহর প্রেরিত ধর্ম ইসলাম কোন সম্প্রদায়ের জন্য নয়, কোন কালের জন্য নয়, নয় কোন বিশেষ এলাকার জন্য। আল কুরআনে মানুষকে আহ্বান করা হয়েছে এ ভাষায়- ইয়া আইয়ুহান নাস্-হে মানবমন্ডলী।
সুতরাং ইসলামকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম বলা অযৌক্তিক ও অসংগত।

(৫) ইসলাম পবিত্র ধর্ম, পবিত্র ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনা উচিত নয়। উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ৩টি কথা:-

প্রথমত: নীতিগতভাবে একটি কথা বলতে হয়। রাজনীতি যারা করেন, তারা জনগণের মনজয় করে তাদের ভোটে নির্বাচিত হতে চান। নির্বাচনের সময় একটি শ্লোগান সর্বত্র শোনা যায়। শ্লোগানটি হল- "অমুক ভাইর চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র।" সুতরাং যারা ফুলের মতো পবিত্র, তারাই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন এবং বিজয়ী হয়ে জনগণের খেদমত করতে চান। মানুষের খেদমত করা হক্কুল ইবাদ-সৃষ্টির সেবা অত্যন্ত পবিত্র কাজ। যারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন, তারাই রাজনীতি করেন, তারাই সৃষ্টির সেরা মানুষ তথা দেশ ও দশের খেদমত করতে চান। তাদের ইচ্ছা, আকাংখা ও নিয়ত পবিত্র আর তাদের চরিত্রও ফুলের মত পবিত্র। অতএব তারা রাজনীতিকে অপরিচ্ছন্ন করবেন না। রাজনীতিকে পবিত্র রাখবেন-এটাই সর্বসাধারণের কাম্য।
দ্বিতীয়ত:
উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে পবিত্র বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পবিত্র ধর্মের অঙ্গচ্ছেদ করলে প্রতিবন্ধী বানিয়ে ফেলা হবে। সুতরাং সবার খেয়াল রাখা দরকার, পবিত্র ধর্মের অঙ্গহানি যেন না হয়।
তৃতীয়ত:
আল্লাহ্ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি প্রদান করে সৃষ্টি করেছেন। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসহ মানুষের সম্পূর্ণ সত্ত্বাকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করার নামই ইসলাম।
মানুষের কাছে আল্লাহর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হল ইসলাম।

আল্লাহ নিজেই বলেন- "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (ধর্ম) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। আর আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের জীবনবিধান হিসেবে কবুল করলাম।"
(সূরা মায়েদা, আয়াত-৩)

অত:পর আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের জন্য হুকুম এল- "তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হও। শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না।" (সূরা: বাকারা, আয়াত-২০৮) তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সাবধান বাণী আসল- "তোমরা কি (আল্লাহর) কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর, আর কিছু অংশ কর অবিশ্বাস। জেনে রাখো-তোমাদের মধ্যে যারা এমন আচরণ করবে, তাদের এতদ্ব্যতীত আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তারা দুনিয়ার জীবনে অপমানিত ও লাঞ্চিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম আজাবের দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে আল্লাহ্ মোটেই বেখবর নন।" (সূরা বাকারা, আয়াত-৮৫)

পবিত্র ধর্ম যার কাছ থেকে নাযিল হয়েছে, সে মহান আল্লাহর নির্দেশ শোনার পর আমার প্রতিক্রিয়া হল :-

পবিত্র ধর্মে সম্পূর্ণরূপে দাখিল হতে হবে। 'ধর্মের এক অংশ মানব আর অন্য অংশ মানব না'- এ রকম করা যাবে না। যদি আমি কুরআনের একটি আদেশ-তথা আল্লাহর একটি নির্দেশ অস্বীকার করি, তাহলে আমি কাফির হয়ে যাব। কিন্তু যদি স্বীকার করি কিন্তু বাস্তবায়ন করতে গাফলতি করি তাহলে হব মুনাফিক। মুনাফিকের অবস্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে (সূরা: নিসা, আয়াত-১৪৫)। এ ছাড়া দুনিয়ার জীবনে অপমানিত ও লাঞ্চিত হতে থাকব এবং পরকালে কঠিন আযাবের সম্মুখীন হব।

আল্লাহ্ কালামে পাকে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের যত দিক ও বিভাগ আছে, রাজনৈতিক দিক সহ সর্বব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সব নির্দেশের গুরুত্ব সমান। কোন আদেশ অমান্য করার কোন সুযোগ নাই।
সুতরাং কোন মানুষ কিংবা মানব সমষ্টির কথায় পবিত্র ধর্ম ইসলামের কোন অংশ রহিত করার কিংবা মুলতবি রাখার এখতিয়ার কোন মানুষের নাই। যিনি মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে তাঁকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন-"হে মুহাম্মদ তাদেরকে বল, আমার এ কাজ নয় যে, আমার নিজের তরফ থেকে উহাতে (ধর্মে) কোনরূপ রদবদল করে নিব। আমি তো শুধু সে ওহীর অনুসারী, যা আমার নিকট পাঠানো হয়। আমি যদি আমার রবের নাফরমানি করি, তাহলে আমার এক অতি বড় বিভীষিকাময় দিনের ভয় আছে।" (সূরা ইউনুস, আয়াত-১৫)
পবিত্র ধর্ম ইসলাম কিভাবে মানতে হবে তার নমুনা ছিলেন আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)। তার ব্যাপারে আল্লাহ্র সার্টিফিকেট-"তোমাদের জন্য আল্লাহর রসুলের জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ"।

(সূরা: আহযাব, আয়াত নং-২১)

সেই আল্লাহর রসুল হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনিই সমগ্র দুনিয়ার প্রথম লিখিত সংবিধান ৪৭ ধারা বিশিষ্ট মদিনা সনদ ৬২২ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেছিলেন। তাঁর শাসিত মদীনা রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক ইহুদীরাও বসবাস করত।

আমাদের দেশে জনগণের একটি অংশ এমন আছেন যারা সঠিক পদ্ধতি নিষ্ঠার সাথে নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, হজ্জ করেন, সম্পত্তির বাৎসা সঠিক হিসাব করে গুণে গুণে যাকাত আদায় করেন। তাদের ব্যক্তিগত আমল, আখলাকও ভাল। তারা আল্লাহর রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স.) এর

প্রতি মহব্বত রাখেন। রসুল (স.) এর প্রতি কেউ কোন কটাক্ষ করলে তারা ক্ষেপে যান এবং কটাক্ষকারীকে শায়েস্তা করার জন্য আন্দোলন গড়ে তালেন।

আবার তারা ব্যবসা বাণিজ্য, রাজনীতি অর্থনীতি, বিচার ফায়সালা, শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন ও শিক্ষাদান ইত্যাদি সামাজিক ও সামষ্টিক বিষয়ে রাসুল (স.) এর আদর্শ কি তা জানার ও মানবার চেষ্টা করেন না। অনেকে সামাজিক, সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সেকুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা কিংবা কায়েম রাখার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তাদের কেউ এমন মন্তব্য করেন যে, রাসুল (স.) এর যুগের জন্য তাঁর আদর্শ সঠিক ছিল। এখন যুগ বদল হয়েছে, এ যুগের জন্য ঐ আদর্শ এখন অচল। আবার কেউ মন্তব্য করেন বর্তমানে ঐ আদর্শ ফিরিয়ে আমার অর্থ ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘুরানো- অর্থাৎ মধ্যযুগ ফিরিয়ে আনা। এ প্রচেষ্টা প্রগতি বিরোধী। আবার কেউ কেউ নেক নিয়তে বলেন-'রাসুল (স.) এর হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরামের মত সোনার মানুষ আর আসবে না- সুতরাং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, যুগের চাহিদা মিটাতে হবে।'

এ সবার কথার অর্থ দাড়ায়- 'রাসুল (স.) এর আদর্শ আধুনিক যুগে অচল। রাসুল (স.) এর আদর্শ বিশেষ যুগে বিশেষকালের জন্য এসেছিল। তাঁর আদর্শ ও আল-কুরআনের আইনকানুন সার্বজনীন নয়, সবযুগের জন্য নয়, সর্বকালের সব মানুষের জন্য নয়।' নাউজুবিল্লাহ। রাসুল (স.) আল কুরআন ও ইসলামের প্রতি এ রকম দোষারোপ করা ঈমানের পরিপন্থী।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন

রাসুল (স.) রাহমাতুল্লিল আলামিন

কুরআনের আইনকানুন সার্বজনীন।

রাসুল (স.) এর রেসালত কিয়ামত পর্যন্ত, কেননা তিনি শেষ নবী, কিয়ামত পর্যন্ত, আর কোন নবী আসবেন না-আর কোন আসমানী কিতাব ও আসবে না।

হযরত মুহাম্মদ (স.) নিছক কোন ব্যক্তি নন। তিনি আখেরী নবী ও আল্লাহর রাসুল। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা- "রাসুল দ্বীন সম্পর্কে নিজে নিজে কিছু বলেন না। তিনি যা বলেন, ওহি পেয়েই বলেন।"

(সূরা: নযম, আয়াত-৩৩৮)

তিনি নিজের ইচ্ছায় কিছু করেন না। আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু করেন। তাই রাসুল (স.) যা বলেন, যা করেন এবং যা করার অনুমতি প্রদান করে সবই সুন্নাহ-দলিল।

" তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" (সূরা: আহযাব, আয়াত-২৯)

সেই আল্লাহর রাসুল (স.) নামাজ কি ভাবে পড়তে হবে, রোজা কিভাবে রাখতে হবে, কিভাবে হজ্জ করতে হবে, কিভাবে যাকাত আদায় করতে হবে-তা দেখিয়ে দিয়েছেন। একই সাথে তিনি কিভাবে পরিবার পরিচালনা করতে হবে, কিভাবে প্রতিবেশীর হক আদায় করতে হবে, তাও শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ব্যবসা পরিচালনা করেছেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়মনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শ্রমিকের ঘাম শুকাবার আগে মজুরী প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি চল্লিশ দিনের বেশী খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি বিচারক ছিলেন। আবার বিচারের রায় কার্যকর করার ব্যবস্থা করতেন। তিনি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি এতিমের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি নারীর সঠিক সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছেন। তিনি মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তিনি দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বপ্রথম ৬২২ খ্রিস্টাব্দে লিখিত সংবিধান রচনা করেন যা মদীনা সনদ হিসাবে পরিচিত। তাঁর সময়ে তাঁর পরিচালনাধীন রাষ্ট্রের সাথে বিরুদ্ধ শক্তির সাতাশটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর মধ্যে রাসুল (স.) স্বয়ং নয়টি যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি (commander-in-chief) হিসাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি বিদেশী রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে পত্র যোগাযোগ করেছেন। তার চিঠিতে official seal (মোহর অংকিত) থাকত। তিনি রাষ্ট্রদূতদের সাথে নিয়মিত সাক্ষাত প্রদান করতেন। তিনি প্রতিপক্ষের সাথে সন্ধি করেছেন এবং প্রতিপক্ষ সন্ধিভঙ্গ করার আগে সন্ধির কোন শর্ত ভঙ্গ করেননি। তিনি সমাজে প্রচলিত সুদ নিষিদ্ধ করেছেন এবং সমাজ থেকে মদ উৎখাত করেছেন। তিনি মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে আযাদ করেছেন। তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন সত্য চিরসত্য, সত্য আপেক্ষিক নয়।

এসব তিনি করেছেন ব্যক্তি মুহাম্মদ হিসাবে নয়-মুহাম্মদর রাসুলুল্লাহ-আল্লাহ্র রাসুল হিসাবে। তিনি মসজিদে ইমামতি করার সময় যেমন আল্লাহর রাসুল ছিলেন উপরে বর্ণিত এবং বর্ণনার বাইরে সামষ্টিক সবকাজ পরিচালনার সময় ও তিনি আল্লাহর রাসুল ছিলেন। রসুল (স.) এর গোটা জীবনটাই ইসলামী জীবন এবং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে সামিল। মুহাম্মদর রাসুলুল্লাহ

(স.) হিসাবে রাসুলের সব কথা, কাজ ও অনুমোদন সকল মুসলমানের অবশ্য পালনীয়। এ ব্যাপারে যে ব্যর্থতার পরিচয় দিবে, সে রেসালাতের প্রতি ঈমানদার হতে পারল না।

সুতরাং রাসুলুল্লাহ্ (স.) এর উপস্থাপিত আদর্শ ব্যতীত অন্য কোন আদর্শ, কোন মতবাদ অনুসরণ করা রাসুলের অনুসারী 'উম্মার' কোন সুযোগ নাই।

অতএব একজন দ্বীনদার, ঈমানদার, রেসালতে বিশ্বাসী নবীপ্রেমিক উম্মাতে মোহাম্মদীর পক্ষে সেকুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ, তথা ধর্মহীনমতবাদ তথা ইহজাগতিকতাবাদ-যা সম্পূর্ণ মানবরচিত একটি পাশ্চাত্য মতবাদ-অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

এ পর্যায়ে রাসুলুল্লাহ (স.) এর একটি হাদিস উল্লেখ করা হচ্ছে:-

"তোমাদের দ্বীনের আরম্ভ নবুয়ত ও রহমতের মাধ্যমে এবং তা তোমাদের মধ্যে থাকবে- যতক্ষন আল্লাহ্ চান। অত:পর আল্লাহ্ তাও উঠিয়ে নিবেন।

তারপর নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত পরিচালিত হবে যতদিন আল্লাহ চান। অতঃপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন। তারপর শুরু হবে দুষ্ট রাজতন্ত্রের জামানা এবং যতদিন আল্লাহ চাইবেন, তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তারপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর জুলুমতন্ত্র শুরু হবে এবং তাও আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন, ততদিন থাকবে, অতঃপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নিবেন।

অতঃপর আবার নবুয়তের পদ্ধতিতে (খিলাফত আ'লা মিমহাজুন নবুয়ত) প্রতিষ্ঠিত হবে। নবীর সুন্নত অনুযায়ী তা মানুষের মধ্যে কাজ করে যাবে এবং ইসলাম পৃথিবীতে তার কদম শক্তিশালী করবে। সে সরকারের উপর আকাশবাসী ও দুনিয়াবাসী সবাই খুশি থাকবে। আকাশ মুক্ত হৃদয়ে তার বরকত বর্ষণ করবে এবং পৃথিবী তার পেট থেকে সমস্ত গুপ্ত সম্পদ উদ্গীরন করে দেবে।

[এ হাদিসটি মুসলিম, তিরমিযি, ইবনে মাজা মুসনাদে আহমদ হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ আছে।]

আরব ও ইসলামী বিশ্বে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার কুফল:

ইসলামী বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তারের ফলে মুসলিমদের দ্বীন ও দুনিয়া ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখানে আমরা তার কিছু কুফল বর্ণনা করছি:

১. সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তারের ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধানকে নিষিদ্ধ করা, জীবনের সকল শাখা থেকে শরীয়তকে বিতাড়িত করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত ওহীর পরিবর্তে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী কাফেরদের তৈরি বিধানকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আল্লাহর বিধানকে মানা ও মানব-রচিত বিধান প্রত্যাখ্যান করার আহ্বানকে তারা প্রগতির অন্তরায়, পশ্চাৎগামী ও রক্ষণশীলতা জ্ঞান করে। আল্লাহর দিকে দা‘ঈ বা আহ্বানকারীদেরকে

তারা নানাভাবে হেয় ও উপহাস করে, সরকারি চাকুরী ও ক্ষমতা থেকে দূরে রাখে, যেন তারা জাতি ও যুবকদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম না হয়।

২. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের কাজই হচ্ছে ইসলামী ইতিহাসকে বিকৃত করা, তাতে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটানো ও দিগ্বিজয়ী ইসলামী আন্দোলনের ফসল স্বর্ণযুগকে ব্যক্তি স্বার্থ ও জঙ্গীবাদ বা জংগলীপনার ফলাফল বলে গালমন্দ করা এবং সমাজে এ জাতীয় ধ্যান-ধারণা তৈরি করা।

৩. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার সেবাদাসরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তাদের সেকুলার মতাদর্শের সেবক বানানোর কাজে লিপ্ত। এ কাজ তারা বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করে, যেমন:

ক. শিক্ষা উপকরণ ও সিলেবাস দ্বারা ছাত্রদের মাঝে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রচার করা।
খ. ধর্মীয় শিক্ষার নির্ধারিত সময় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা ও সংকুচিত করা।
গ. নির্দিষ্ট কতক ধর্মীয় বিষয় পাঠদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, যে বিষয়গুলো সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের শিকড় উপড়ে ফেলতে পারে কিংবা সে মতবাদের ভ্রষ্টতার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।
ঘ. শরীয়ত তথা কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন ভাষ্যের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যা ছড়িয়ে বিকৃতি ঘটানো, যেন মানুষ বুঝে শরীয়ত সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করে, অথবা ন্যূনতম পক্ষে বুঝে যে, ইসলামের সাথে তার সংঘর্ষ নেই।
ঙ. পূর্ণাঙ্গভাবে দ্বীন পালনকারী শিক্ষকদেরকে পাঠদান ও শিক্ষাঙ্গন থেকে দূরে রাখা এবং ছাত্রদেরকে তাদের সাথে মিশতে না দেওয়া। এ কাজ তারা বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করে, যেমন দাফতরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে তাদেরকে ব্যস্ত রাখা, অথবা অর্থ উপার্জনের অন্য কোনো পথে তাদেরকে মগ্ন করে দেওয়া।
চ. ধর্মীয় বিষয়কে গুরুত্বহীন ও অতিরিক্ত বিষয়ের মান দেওয়া, যেমন শেষ পিরিয়ডে রাখা, যখন ছাত্রদের মাঝে ক্লান্তির ভাব সৃষ্টি হয়, যেন তারা ধর্মীয় শিক্ষায় উজ্জীবিত না হয়। আবার এমনভাবে এ বিষয়কে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যে এর সাথে ছাত্রদের পাশ-ফেলের সম্ভাবনা না থাকা।

৪. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, সত্য দ্বীনের অনুসারী ও মিথ্যা-বিকৃত দ্বীনের অনুসারী যেমন মুসলিম-ইয়াহূদী-খৃস্টান ও নাস্তিকদের থেকে পার্থক্য তুলে দেয়া, অতঃপর সবাইকে এক মানদণ্ডে রাখা ও বাহ্যিকভাবে সবাইকে সমান মর্যাদা দেয়া, যদিও সত্যিকার অর্থে তারা কাফের, নাস্তিক, পাপাচারী ও অপরাধীদেরকে তাওহীদের ধারক-বাহক, আল্লাহর আনুগত্যকারী ও ইমানদার লোকদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।
এ মতবাদের সামনে মুসলিম, খৃস্টান, ইয়াহূদী, ব্রাহ্মণ, মূর্তিপূজক সবাই সমান, তাদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব তখনই তাদের কাছে মুখ্য হবে যখন কেউ তাদের মতবাদের আহ্বানে সাড়া দিবে।
এ মতবাদের ধ্বজাধারীদের দৃষ্টিতে খৃস্টান, ইয়াহূদী, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ বা সমাজতন্ত্রীর সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে বৈধ, কোনো সমস্যা নেই, অনুরূপ তার দৃষ্টিতে মুসলিম দেশে ইয়াহূদী অথবা খৃস্টান অথবা অন্য কোনো কুফরি ধর্মের অনুসারীর শাসক হতে সমস্যা নেই।
তারা জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদের আড়ালে মুসলিম দেশের কর্তৃত্ব কাফেরদের হাতে তুলে দিতে চায়।
বরং জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদ ও দেশের অখণ্ডতাকে মূলনীতি ও একমাত্র ঐক্যের বন্ধন হিসেবে দেখে। কুরআনুল কারীমের যে অংশ অথবা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদিস তাদের এ তথাকথিত জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদ নীতি বিরুদ্ধ হয়, তাকেই তারা ছুড়ে ফেলে ও প্রত্যাখ্যান করে। আর বলে: এটা দেশীয় একতা ও ঐক্য বিনষ্টকারী!

৫. এ মতবাদের অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার প্রসার করা এবং পারিবারিক সিস্টেম ধ্বংস করা। এ জন্য তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যেমন:

ক. অশ্লীলতাকে বৈধতা দেওয়া ও তার জন্য কাউকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না মর্মে আইন প্রণয়ন করা; যার দৃষ্টিতে ব্যভিচার ও সমকামিতা ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত, যে ব্যক্তি স্বাধীনতা! প্রত্যেকের জন্য নিশ্চিত করা জরুরি।
খ. শালীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী ও সেগুলোর সহায়তায় নিয়োজিত পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও রেডিও-টেলিভিশনের অনুমোদন দেওয়া ও তাতে অংশ গ্রহণ করা। কখনো পরোক্ষভাবে আবার কখনো প্রত্যক্ষভাবে সেসব অশ্লীলতা প্রচারে রত থাকা।
গ. স্কুল-ভার্সিটি, সামাজিক সংগঠন ও সংস্থাসমূহে পর্দা নিষিদ্ধ করা এবং অবাধ মেলামেশা ও অশ্লীলতাকে চাপিয়ে দেওয়া।

৬. বিভিন্নভাবে ইসলামী দাওয়াত বাধাগ্রস্ত করা, যেমন:

ক. ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারণায় বিধি-নিষেধ আরোপ করা, পক্ষান্তরে যেসব বই-পুস্তকের কারণে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করবে, ইসলামী ঈমান-আকিদা বিনষ্ট হবে ও শরীয়তের ব্যাপারে সন্দেহ তৈরি হবে, সেগুলো অধিকহারে প্রকাশ ও বিতরণ করা।
খ. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বী লোকদের বিভিন্ন মিডিয়ায় সুযোগ দেওয়া, যেন তারা দেশের অধিকাংশ মানুষের সামনে তাদের পথভ্রষ্টতা প্রচার করার সুযোগ পায় ও শরীয়তকে বিকৃত করতে সক্ষম হয়; পক্ষান্তরে যেসব আলেম মানুষের সামনে দ্বীনের হাকিকত তুলে ধরবেন তাদেরকে মিডিয়ায় নিষিদ্ধ করা হয়, অথবা ইসলামিক মিডিয়াগুলো বন্ধ করা হয়।

৭. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর পথে আহ্বানকারী দা‘ঈদের হয়রানী করে বেড়ানো, তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা, তাদের উপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করা এবং তাদেরকে বিভিন্ন খারাপ বিশেষণে বিশেষায়িত করা; সমাজে প্রচার করা যে, তারা রক্ষণশীল, বিবেক প্রতিবন্ধী ও পশ্চাতমুখী; আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে বৈরিতা পোষণকারী, চরমপন্থি ও উগ্রবাদী, বাস্তবতা বুঝে না, তারা মূল বস্তু ত্যাগ করে খোসা ধরে রাখে ইত্যাদি।

৮. এ মতবাদের অনুসারীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, যেসব মুসলিম সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে আপোষ করে না তাদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়া, তাদেরকে দেশান্তর করে দেওয়া, অথবা জেলে দেওয়া অথবা হত্যা করা।

৯. এ মতবাদের অনুসারীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের আবশ্যকতা অস্বীকার করা, জিহাদ নিষিদ্ধ করা এবং জিহাদকে একপ্রকার ডাকাতি ও বর্বরতা জ্ঞান করা। কারণ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অর্থ আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করা, যেন পৃথিবীর বুকে ইসলামী হুকুমত ব্যতীত দাপুটে ও শক্তিধর কোনো হুকুমত না থাকে; পক্ষান্তরে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার সকল শাখা থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করা। ধর্ম সম্পর্কে তাদের সবচেয়ে সুন্দর উক্তি হচ্ছে: “মানুষ ও তার উপাস্যের মাঝে ধর্ম বিশেষ এক বন্ধন, যার প্রভাব ইবাদতগৃহের বাইরে ব্যক্তির কথা, কাজ ও চরিত্রে প্রতিফলিত হবে না”। অতএব আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্যে জিহাদের অনুমতি তাদের দৃষ্টিতে না-থাকাই স্বাভাবিক।

ধর্মনিরপেক্ষ ও তার অনুসারীদের নিকট সম্পদ ও ভূ-খণ্ড রক্ষা ব্যতীত যুদ্ধ করা বৈধ নয়; দ্বীনের সুরক্ষা, দ্বীন প্রচার ও তার বিজয়ের জন্য জিহাদ করা তাদের নিকট বর্বরতা ও সীমালঙ্ঘনের শামিল, যা সভ্য প্রগতিশীল মানুষের নিকট গ্রাহ্য নয়!!

১০. তারা জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের দাওয়াত দেয়, তার ভিত্তিতে তারা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখে। তাদের নিকট একতার মানদণ্ড হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, অথবা ভাষা, অথবা ভূ-খণ্ড অথবা পার্থিব কোনো স্বার্থ; ধর্মের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হওয়া তাদের সংবিধানে বৈধ নয়, বরং দ্বীন তাদের দৃষ্টিতে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির বড় কারণ। তাদের কেউ এমনও বলেছে: "রক্তাক্ত শতাব্দীগুলোর অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, পরকালীন জীবনের নিরাপত্তার জিম্মাদার কথিত ধর্ম বা দ্বীন শান্তিকে ধ্বংস করেছে"।

আমরা এখানে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদের জন্ম দেওয়া মুসলিম দেশে বিদ্যমান কয়েকটি কুফল উল্লেখ করলাম, বস্তুত তার কুফল আরো অধিক, আরো ব্যাপক।

কেউ দৃষ্টি দিলে এ সকল কুফল অথবা তার বেশিরভাগ কুফল অধিকাংশ মুসলিম দেশে অনুভব করবে বা স্বচক্ষে দেখবে। আরো দেখবে যে, মুসলিম দেশের গভীর পর্যন্ত এ সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা স্বীয় শিকড় শক্তিশালী করেছে।

একজন মুসলিম তার ডানে-বামে মুসলিম অধ্যুষিত যে কোনো দেশের দিকে তাকালে খুব সহজে, বিনা কষ্টে ও অনায়াসে সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার এক বা একাধিক কুফল দেখতে পাবে, বরং তার বিবিধ কুফল থেকে মুক্ত কোনো দেশ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

টলারেন্স নীতির ভয়ালদর্শন

সেক্যুলারদের দেওয়া ব্যাখ্যা মেনে নিলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের সকল বিধান অনর্থক হয়ে পড়ে। এখন যদি দুজন নারী পুরুষ মিলেমিশে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়ায় এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তা হলে ইসলাম তাদের উপর হদ প্রয়োগ করতে পারে না। কারণ এটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এভাবে সমষ্টিগত জীবনের প্রতিটি বিধানই অকার্যকর হয়ে যাবে; যদি আয়াতের এমন ব্যাপক অর্থ নেওয়া হয়। তা ছাড়া কোনো মুফাসসির আয়াতটির এমন তাফসির করেননি। আয়াতের অর্থ হলো, কোনো মানুষের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করানোর ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। এই ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি অর্থহীন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাদের উপর ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যাবে না। বরং যার জন্য যেই বিধান ও বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য, তা তার উপর যথাযথভাবে প্রয়োগ হবে।

মূলত ইসলামে সব ধরনের জবরদস্তি নিষিদ্ধ নয়। বরং যেই জবরদস্তি শরিয়তে নেই, তাকেই কেবল ইসলাম নাকচ করে। আল্লামা শাতেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আয়াতটি অবতীর্ণ করা হয়েছে সেই ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য, যে শরিয়তবহির্ভূত পন্থায় জবরদস্তি করে। যেমন, কেউ কোনো পুরুষকে চাপ দিল তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে (এটা নিষিদ্ধ)। তবে যখন শরিয়তের নির্দেশিত পন্থায় জবরদস্তি করা হবে তা অবশ্যই গ্রাহ্য হবে। যেমন, কোনো কাফের তরবারির ছায়ায় ইসলাম কবুল করল।

সুতরাং ইসলামে নিরপেক্ষতা এবং সমান অধিকার বলতে কিছু নেই। বরং ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করে। শরিয়তপ্রদত্ত অধিকারকেই বাস্তবায়িত করে। ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম। এটাই ইসলামের পরিচয়। শান্তি, নিরাপত্তা, সমতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি দিয়ে ইসলামকে জাস্টিফাই করার অধিকার কারো নেই। কারণ ইসলাম এগুলোর দাবি করে না। ইসলামে নিরপেক্ষতা কিংবা সমতা থাকলে ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি কুফর প্রচারেরও অনুমোদন থাকত। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্র কখনোই কুফর প্রচারের অনুমতি দেয় না। সম্পূর্ণরূপে কুফরের প্রচার-প্রসার নিষিদ্ধ করে। জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমে আহলে কুফুর কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়ে ধর্মীয় কার্যকলাপ পালন করতে পারে। তবে তাও মুসলিমদের অধীনস্থ হয়ে এবং অত্যন্ত গোপনে।

ইসলামে নিরপেক্ষতা থাকলে একজন অমুসলিমও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার লাভ করত। কিন্তু ইসলাম কোনো অমুসলিমকে সেই অধিকার দেয়নি। এটাই ন্যায্য বিধান।

ইসলামি রাষ্ট্রে চুক্তি ও জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমে যারা জিম্মি হবে, তাদেরকে ইসলাম নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার দিয়েছে। তবে ব্যাপারটা এতো ব্যাপক না এবং ইসলামের মতো সমান অধিকারও না সেটা। নির্দিষ্ট কিছু শর্ত ও সীমাবদ্ধতা জারি করার মাধ্যমে তারা নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় সুবিধা পাবে। এখনকার মতো অলিগলিতে শিরক ও কুফুরের জৌলুস, পরিবেশ ভারি-করা আয়োজন, নির্লজ্জ ও অশ্লীল মহড়া এবং শক্তিমত্তা প্রদর্শনের অনুমোদন তারা পাবে না। এগুলো ইসলামসমর্থিত অধিকার নয়। জিম্মিদের বিধান নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই। ফিকহের প্রতিটি গ্রন্থে উম্মতের ফকিহগণ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। মোটাদাগে ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের জন্য বিধিবদ্ধ নিয়ম হলো,

১। জিজিয়া প্রদান ব্যতীত ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসের অধিকার পাবে না।

২। নতুন কোনো উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারবে না (যদি রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি থাকে তবে ভিন্ন কথা)।

৩। নিজেদের ধর্মের প্রচার চালাতে পারবে না মুসলিমদের মাঝে।

৪। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে তারা নিয়োগ পাবে না।

এই ধরনের কিছু বিধিবদ্ধ আইন রয়েছে, যেগুলো সামনে রাখলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের বর্তমান সেক্যুলার অধিকার ইসলাম দেয় না। ইসলাম তাদের যতটুকু অধিকার দেয়, তাই ন্যায্য। আমরা মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে আজকাল এসব বিষয় কাটছাঁট করে থাকি।

এই ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করা বড় ফ্যাক্ট হয়ে দাঁড়ায়; অথচ ইসলামের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য কাটছাঁট না করে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরাই অধিক ফলপ্রসূ। মানুষের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করানো আমাদের দায়িত্ব না। আল্লাহ এই ক্ষমতা কোনো মানুষকেই দেননি। ফলে এমন কাটছাঁটের বিশেষ কোনো ফায়দা নেই। এতে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হচ্ছে- আমরা মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে ফেলছি। আমরা ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ করলে আল্লাহ যাকে হেদায়েত দিতে চান তার কাছে এটাই সত্য ও ইনসাফ মনে হবে। আর যাকে চান না তার কাছে গোঁড়ামি, বাড়াবাড়ি ইত্যাদি মনে হতে পারে। কিন্তু তার এই ধারণা দূর করার জন্য কাটছাঁটের অনুমোদন দেওয়া হয়নি। বরং আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আপসহীনভাবে ইসলাম যা বলেছে, তা পালন করে যাওয়া।

আমরা নিজেদের শরিয়ত নিয়ে এক ধরনের হীনম্মন্যতায় ভুগি। আমরাই নিজেদের শরিয়তকে একরকম উগ্রতা, গোঁড়ামি ও বেইনসাফি মনে করি। তা না হলে তো এসব বিধানের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের সাথে আপসের নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়ত না। আল্লাহ যে অধিকার অবস্থাভেদে মানুষকে দিয়েছেন, তা আসলেই ন্যায্য কি না- এ ব্যাপারে আমরা দ্বিধা- সংশয়ে ভুগি। আমরা কোনোপ্রকার তোষামোদি ছাড়া বলতে পারি না এটাই ন্যায় ও সত্য। এর একমাত্র কারণ আমরা পাশ্চাত্যের মানদণ্ড মেনে নিয়েছি। অথচ একটা সেক্যুলার রাষ্ট্রে কোনো অ-সেক্যুলার বেঁচে থাকার অধিকার পায় না। যেখানে সেক্যুলারিজম অ-সেক্যুলার নাগরিকদের উপর হত্যা কিংবা বন্দির বিধান প্রয়োগ করতে কোনো কপটতার আশ্রয় নেয় না, সেখানে কীভাবে আমরা নিজেদের শরিয়তের ব্যাপারে এমন কপটতার আশ্রয় নিতে পারি; অথচ আমাদের শরিয়ত এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি সবকিছুর মালিক, সেক্যুলাররাও যার সৃষ্টি? স্রষ্টার সাথে বিদ্রোহ করার ব্যাপারে তারা এতটা আপসহীন হতে পারে আর আমরা রবের দাসত্বে আপসহীন হতে পারছি না!

ইতোপূর্বে সেক্যুলারিজমের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে, পরিণামের দিক থেকে সংজ্ঞাটা প্রতারণা ছাড়া কিছুই না। কারণ প্রকৃতপক্ষেসেক্যুলারিজম যদিও রাষ্ট্র থেকে আসমানি ধর্মকে পৃথক করে তবে ব্যক্তিগত বিষয় বলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সে আত্মপূজারি আরেকটি ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে। আরো স্পষ্ট করে বললে সেক্যুলারিজম নিজেই একটি ধর্ম। এই ধর্মের শরিয়ত কিংবা

সাংবিধানিক মাপকাঠি হলো হিউম্যানিজম। এই ধর্মের প্রভু হলো মানুষ এবং জ্ঞানের উৎস হলো আকল। সেক্যুলারিজম নিজেই একটি ধর্মীয় অথরিটি সংরক্ষণ করে। সে অন্যান্য ধর্মের উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সকল ধর্মীয় অনুশাসনকে সে নিজস্ব মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করে। সে যদিও মুখে বলে যে সব ধর্ম তার স্বাধীনতা পাবে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সেক্যুলারিজম একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে তার ধর্মে ঘোষিত হালাল গ্রহণ করতে এবং হারাম বর্জন করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তার নিজস্ব হালাল-হারাম তথা বৈধতা-অবৈধতার ধারণা রয়েছে। সেই ধারণার ভিত্তিতেই সে প্রতিটি বিষয়ের অনুমোদন দিয়ে থাকে। তার নিজস্ব বৈধতার ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক যেকোনো বিষয় সে বেআইনি এবং বাতিল করে দিতে পারে। মোটকথা, একটি ধর্মের ফুল কনসেপ্ট সেক্যুলারিজমে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বলতে হবে, সেক্যুলারিজম কখনোই ধর্মনিরপেক্ষতা নয়; বরং সে নিজেই একটি ধর্ম।

তবে চিন্তার বিষয় হলো, সেক্যুলারিজম সকল ধর্ম সরিয়ে একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও কেবল ইসলামের সাথেই কেন সূচনালগ্ন থেকে এর সামগ্রিক সংঘর্ষ চলে আসছে এবং ইসলামের উপরই কেন তার আঘাতটা বেশি পড়ছে? এর প্রধান কারণ তো তা-ই, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ১৪শ বছর আগে। وَالْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ অর্থাৎ ইসলামের বিরুদ্ধে সমস্ত কুফরিশক্তি একজোট।" তবে এর অন্তর্নিহিত কারণটা দৃষ্টিভঙ্গিজনিত এবং আদর্শিক। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম মূলত কিছু বিশ্বাস আর আচার-অনুষ্ঠানের নাম। জীবনের সামগ্রিক নির্দেশনা সেসব ধর্মে নেই। ব্যক্তিগত কিছু দৃষ্টিভঙ্গির মাঝেই সেই ধর্মগুলো সীমাবদ্ধ। ব্যাপকভাবে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিধানশূন্য। ফলে সেই শূন্যস্থান কোনোপ্রকার সংঘর্ষ ছাড়াই পাশ্চাত্য সভ্যতা পূরণ করে নিয়েছে।পক্ষান্তরে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ইসলামের দিকনির্দেশনা রয়েছে। এখানে শূন্যস্থান বলতে কিছু নেই। যার দরুন পাশ্চাত্য সভ্যতার কোনো কিছু এখানে অনুপ্রবেশ করতে হলে শূন্যস্থান তৈরি করে নিতে হবে। আর কোনো ভরাট জায়গায় শূন্যস্থান তৈরি করতে গেলেই সংঘর্ষ, মারামারি ও কাটাকাটির ব্যাপার চলে আসে। কোপটা তাই ইসলামের উপরই বেশি পড়ে। তা ছাড়া পাশ্চাত্যের প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গির সাথেই ইসলামের ঐতিহাসিক এবং আদর্শিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। পাশ্চাত্যের ইতিহাসের আলোচনায় বিষয়টি সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সেক্যুলারিজম যেমন ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে না, তেমনিভাবে সব ধর্ম ও মতবাদের প্রতি সে নিরপেক্ষও থাকে না। কারণ সেক্যুলারিজমের নিজস্ব আইনি কিংবা সাংবিধানিক কাঠামো আছে। আছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে আলাদা ধারণা। সেক্যুলারিজম তার নিজস্ব মাপকাঠি অনুযায়ী বিচার করে দেখবে কোন বিষয়টা তার সাথে সাংঘর্ষিক কিংবা তার উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। এমন যেকোনো বিষয় সে দমন করবে এবং

নিষিদ্ধ করবে। এই অর্থে সে কখনোই নিরপেক্ষ কিংবা টলারেন্ট হতে পারে না। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে তো নয়ই, ব্যক্তিগত পর্যায়েও সেক্যুলারিজম অনেক সময় নিরপেক্ষ নয়। এজন্য দেখা যায় 'হজাব,। বয়ে, দাড়ির মতো ব্যক্তিগত ইসলামি বিধানগুলোও সেক্যুলার রাষ্ট্রে নানাভাবে আইনি জটিলতার শিকার হচ্ছে। এসব ঘটনা অহরহ ঘটছে। বিষয়টি এখন সবার কাছেই স্পষ্ট। কারণ, এগুলো তাদের ব্যক্তি- স্বাধীনতায় খারাপ প্রভাব ফেলে। এখানে এসে জেনারেল উইল এবং উইল অফ অলের পার্থক্য বুঝার গুরুত্ব ধরা পড়ে।

মূলত পৃথিবীতে নিরপেক্ষতা (no position) বলতে কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেকেই যেকোনো একটা মাপকাঠির অধীনে সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকে। এই অর্থে যারা নিজেদের নিরপেক্ষ দাবি করে, তারা যেন সমস্ত উসুল থেকে বেরিয়ে শূন্যে অবস্থান করছে! এটা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই না। দুনিয়ায় এমন কোনো অবস্থান নেই, যা নিরপেক্ষ হতে পারে। উদাহরণত কেউ বলল, 'আমি অমুক বিষয়ে মুসলিম না হয়ে নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে চিন্তা করব।' এমন মন্তব্য চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্বুদ্ধিতা। ইসলামের অবস্থান থেকে সরে গিয়ে সে তো কুফুরি অবস্থান গ্রহণ করছে। সেটা আবার নিরপেক্ষ হয় কীভাবে! ইসলামের বাইরে যাওয়ার অর্থই হলো কুফুরি গ্রহণ করা। আর কুফর স্বয়ং একপাক্ষিক অবস্থান। ঈমান ও কুফুরের মাঝামাঝি কোনো অবস্থান নেই। ইমামগণ বহু আগেই এই অবস্থান নাকচ করে গেছেন।
'আবদিয়্যাত' থেকে বেরিয়ে মানুষ কখনো নিরপেক্ষ হয় না। বরং সে খায়েশ এবং শয়তানের গোলাম হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين
অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

সুতরাং ইসলামে যেমন কোনো নিরপেক্ষতা নেই তেমন সেক্যুলারিজমেও কোনো নিরপেক্ষতা নেই। হয়তো ইসলাম নয়তো কুফর। কোনো মুসলমান সেক্যুলারিজমকে গ্রহণ করতে পারে না। ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, একটি ইসলামি রাষ্ট্রে সব মতের লোক সমান অধিকার পায় না, কোনো কাফের মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা রাষ্ট্রীয় কোনো পদ লাভ করতে পারে না। সেক্যুলারিজমও এর ব্যতিক্রম নয়। কার্যত কোনো মুসলিম সেক্যুলার রাষ্ট্রের পদ গ্রহণ করতে পারে না। এর জন্য তাকে সেক্যুলার হতে হয়। কুরআন-সুন্নাহর উপর সেক্যুলার সংবিধানকে প্রাধান্য দিতে হয় তাকে। এই শপথ না করে সে কোনো পদ লাভ

করতে পারবে না। সেক্যুলার শাসন-ব্যবস্থা তার সেক্যুলারিজম নামক ধর্মে বিশ্বাসী নাগরিকদের বাইরে অন্য নাগরিকদের সমান অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, তার বসবাসের অধিকারই মেনে নেয় না। হয়তো তাকে হত্যা করে কিংবা বন্দি করে। সুতরাং সেক্যুলারিজম কখনোই নিরপেক্ষ হতে পারে না। তা কখনো সব মত ও পন্থাকে সম-অধিকারও প্রদান করে না। সুতরাং মুসলিমদের জন্য সেক্যুলারিজম কখনোই কোনো সমাধান হতে পারে না; যেহেতু এটা প্রথমেই আল্লাহর আইনকে প্রত্যাখ্যান করে।
আমাদের উল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা যায় সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞাগত দিক হোক কিংবা ফলগত, কোনো দিকই ইসলামসম্মত নয়। শরিয়ত উভয় দিকই প্রত্যাখ্যান করে।

সেক্যুলারিজমের ইসলামিকরণ ও শারীয়াহ সংঘর্ষঃ

সেক্যুলারিজমকে যারা ধর্মীয় পোশাক পরাতে চায়, তারা তাদের এই জঘন্য কর্মের পেছনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকে মদিনা সনদকে। 'মদিনা সনদ'কে সামনে রেখে তারা মানুষকে দেখাতে চায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ)। যে রাসুলকে প্রেরণই করা হয়েছে ইসলামকে সমস্ত ধর্ম, মতবাদ ও ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করে সকল বাতিল ও ভ্রান্ত চিন্তাধারা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য, তার ব্যাপারে এমন দাবি করা যে জঘন্য অপবাদ- তা একজন চিন্তাশীল সাধারণ মুসলিমেরও বুঝে আসার কথা। উপর্যুক্ত দাবি এতটাই অনর্থক যে, এটাকে খণ্ডন করা কেবল সময় নষ্ট করা হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের এতটাই অধঃপতন হয়েছে যে, বর্তমান বাস্তবতায় মুসলমানরা উপর্যুক্ত দাবিকেই বিশ্বাস করে নিচ্ছে। তাই কালের বিবর্তনে সেই সময় নষ্ট-করা কাজটিই জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এখানে একেবারে সংক্ষেপে মদিনা সনদের ব্যাপারে কিছু পয়েন্ট তুলে ধরব।

এক. ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সালাফদের কেউই ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে মদিনা সনদের টার্ম ব্যবহার করেননি এবং কেউই মদিনা সনদকে ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি সাব্যস্ত করেননি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে সাহাবিদের যুগ পেরিয়ে ইমাম-সালাফদের কারো কাছ থেকেই এটা প্রমাণিত নয়।

দুই. মদিনা সনদ কেবল একটি প্রতিরক্ষামূলক অঙ্গীকারনামা, যার উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক অবস্থায় শত্রু না বাড়িয়ে বরং এক শত্রুর বিরুদ্ধে আরেক শত্রুকে ব্যবহার করা। আর কোনো অঙ্গীকারনামা কখনোই মৌলিক ভিত্তি হতে পারে না। কারণ অঙ্গীকারনামা অস্তিত্বে আসেই

একটা সাময়িক এবং আপাত-পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে, যা চূড়ান্ত কিছু হয় না। যেমন হুদায়বিয়ার চুক্তির কথাই ধরা যাক। সেখানে চুক্তির একটি বিষয় ছিল কোনো কাফের মুসলমান হয়ে রাসুলের কাছে চলে এলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। এটা ছিল সাময়িক সিদ্ধান্ত। মৌলিকভাবে ইসলাম কখনোই এটা সমর্থন করে না।

তিন. মদিনা সনদ কেন ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি হতে পারে না এর সবচেয়ে বড় সত্য উত্তর হলো, ইসলামি শরিয়ত তখনো অপূর্ণাঙ্গ ছিল। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে অনেক বিধান এসেছে, যা মদিনা সনদে ছিল না। এমনকি তখন জিজিয়ার বিধানও ছিল না। ফলে মদিনা সনদ চূড়ান্ত এবং অকাট্য কোনো বিষয়ের মধ্যে পড়ে না যে, কেবল এর ভিত্তিতেই একটি ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।

চার. সর্বশেষ বিষয় হলো, কেউ যদি মদিনা সনদের ধারাগুলো ভালোভাবে লক্ষ করে তবে সেখানে সে কোনোভাবেই সেক্যুলার রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পাবে না। কারণ মদিনা সনদের অন্যতম প্রধান ধারাই হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চূড়ান্ত বিচারক হিসেবে মেনে নেওয়া। এই ধারাটি এতটাই সামগ্রিক যে মদিনা সনদের পরে আসা শরিয়তের সমস্ত বিধান শামিল করে নেয় এবং এই ধারার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শরিয়াই রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি; মদিনা সনদ নয়।

এ ছাড়াও কেউ কেউ সেক্যুলারিজমকে তার পারিভাষিক রূপ থেকে বের করে এর ইসলামি সংজ্ঞা দাঁড় করাতে চায়। এখানে কিছু সমস্যা আছে।

প্রথমত বিজাতীয় যেকোনো পরিভাষাকে ইসলামিকরণ করা শরিয়ত- সমর্থিত নয়। পরিভাষা অধ্যায়ে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ধরুন আমরা সেক্যুলারিজমের ইসলামি ব্যাখ্যা আবিষ্কারের চেষ্টা করছি।আর সবাইকে বলে বেড়াচ্ছি আমরাও সেক্যুলারিজমকে আদর্শিকভাবে বিশ্বাস করি। এখানে সূক্ষ্ম পয়েন্ট হলো, আমরা আদর্শিকভাবে সেক্যুলারিজমকে একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের মানদণ্ড হিসেবে মেনে নিচ্ছি।

এখানে যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক না কেন, সেক্যুলারিজম ফোকাসিং হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে ইসলামই যে একমাত্র মানদণ্ড, কুরআন-সুন্নাহই একমাত্র সত্য বাকি সব মিথ্যা, শরিয়তই একমাত্র নৈতিকতা এবং আদল- নিজেদের এই মানদণ্ড এবং দাবির জায়গায় আমরা দুর্বল হয়ে পড়ছি। এটা প্রথম সমস্যা যে আমরা মানদণ্ডের জায়গাতেই হেরে যাচ্ছি। আর বিশ্বব্যাপী তাদের

মানদণ্ডই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাদের মানদণ্ডকে মেনে নিয়ে নানান ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে চাচ্ছি। মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নানা ব্যাখ্যা আওড়িয়ে বলেননি যে ইসলামেও কুফর আছে। কুফর কুফরই, এর কোনো ব্যাখ্যা নেই।
এর আরেক সমস্যা হলো, মানুষকে আমরা লুকোচুরির মাধ্যমে আশ্বস্ত করতে চাচ্ছি যে, আমরাও সেক্যুলারিজমের চর্চাকারী। এটা কখনো মানুষকে ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য নৈতিক কিংবা আদর্শিকভাবে প্রস্তুত করবে না। দিনে দিনে তাদের মনে সেক্যুলারিজম নামক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে। আর সেক্যুলারিজমের ভিন্ন ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া বলয় দিন দিন মূলধারার সেক্যুলারিজমেই ফিরে যাবে। ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোব বাস্তবতা বিষয়টি আরো শক্তভাবে প্রমাণ করছে। বিভিন্ন দেশের নানা ইসলামি গণতান্ত্রিক দল ইসলামি ভাবধারা ও গঠনতন্ত্র বাদ দিয়ে ক্রমে ক্রমে আরও সেক্যুলার হয়েছে এবং হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত সেক্যুলারিজমের ইসলামি ব্যাখ্যাকাররা এর ইসলামি কাঠামোও দেখাতে পারছে না। সেক্যুলারিজমের যে কাঠামো তারা দেখানোর চেষ্টা করে, তা আসলে ইসলামসমর্থিত কাঠামো নয়। তারা সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞাগত দিকটাই ইসলামি হিসেবে দেখাতে চায় (আর এজন্যই তারা এরদোগানের তুরস্ককে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে। অথচ এরদোগানের দেশেও যেই সেক্যুলারিজমের চর্চা হয়, তা কখনোই ইসলামসমর্থিত নয়)। যেমন, যদি কেউ বলে সেক্যুলারিজমের মানে হলো সকল ধর্ম ও মতের প্রতি উদার এবং নিরপেক্ষ হওয়া, তা হলে তার এই দাবি ভুল। কারণ সেক্যুলারিজমের এই কাঠামোকেও ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম ইসলাম ছাড়া বাকি সব ধর্ম ও মতকে সমান অধিকার দেয় না। যেমন, সেক্যুলারিজম তার বাইরের কোনো মতকে সহ্যই করে না। (ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)

তৃতীয়ত, তারা যাকে সেক্যুলারিজম বলছে, তা আসলে সেক্যুলারিজম নয়। যেমন, ট্রাফিক আইন কিংবা বর্তমান সময়ের নতুন কোনো বিষয়ের আইনকে ইসলামি শরিয়ত সেক্যুলারিজম বলে না। ইসলামে এটাকে কিয়াস কিংবা ইজতিহাদ বলে। সেক্যুলারিজমকে ইসলামিকরণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি উপেক্ষিত হয়, তা হলো তাওহিদুল হাকিমিয়্যাত। তাওহিদুল হাকিমিয়্যাত হলো রাষ্ট্রে ফয়সালা কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র ভিত্তি আল্লাহর শরিয়াহ হওয়া।

الحكم بما أنزل الله
(আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা রায়) প্রদানের চর্চা থাকা। ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তিই হচ্ছে এই হাকিমিয়্যাত। এটাকে আরো মজবুত করার জন্য 'দার'-এর প্রসঙ্গে যাওয়া যেতে পারে। দারুল ইসলাম কিংবা ইসলামি রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় সালাফরা যে বিষয়টি মুখ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন,

তা হলো ইসলামি শরিয়াহ বিজয়ী হওয়া। ইসলামি বিধান প্রতিষ্ঠিত থাকা। এখানে 'দার' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। এ কারণেই ইসলামি ইমামাতের বাইয়াতই সংঘটিত হয় আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের উপর। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আল্লামা মাওয়ারদি রহিমাহুল্লাহর 'আহকামে সুলতানিয়া' দেখা যেতে পারে।

সুতরাং ব্যভিচারের অনুমোদন না দেওয়া, সুদের প্রচলনের সুযোগ না দেওয়া, জিম্মিদের থেকে ট্যাক্স নেওয়া, হুদুদ বাস্তবায়ন করা- এসব হাকিমিয়্যাতেরই অংশ। মুসলিমদের ব্যাপারে যে আদেশ-নিষেধ আছে, তা বাস্তবায়ন করা এবং অমুসলিমদের ব্যাপারে ইসলামি রাষ্ট্রে যে নির্দেশনা

যদিও ফিকহের কিতাবে ট্রাফিক আইন নামে কোনো অধ্যায় নেই; কিন্তু শরিয়তের মৌলিক উসুলের ভিত্তিতে এসব বিষয়ে নানা নির্দেশনা ঠিক করা যেতে পারে। যেমন- নারী ট্রাকিফ নিয়োগ দেওয়া যাবে কি না, একজন ট্রাফিকের শ্রম ও ভাতা কত হবে, গাড়ি ডানে চলবে নাকি বামে ইত্যাদি। তা ছাড়া শরিয়তকর্তৃক ঘোষিত যেকোনো মুবাহ (বৈধ) বিষয় শরিয়তেরই অন্তর্ভুক্ত, যদিও তা নিয়ে পৃথক আলোচনা না থাকে।

রয়েছে, তা প্রয়োগ করাও হাকিমিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে অমুসলিমরা কোনো চুক্তি ভঙ্গ করলে, তার ব্যবস্থা নেওয়াও হাকিমিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত। আবার নতুন উদ্ভাবিত বিষয়কে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিচার করাটাও হাকিমিয়্যাহর আওতাভুক্ত। মোটকথা, ইসলামি শরিয়াহ ও আহকামকে বিচারকের মর্যাদা দেওয়া হলো হাকিমিয়্যাহ, যা প্রকারান্তরে আল্লাহ ও তার রাসুলকেই বিচারক মানা। তাওহিদুল হাকিমিয়্যাতকে না বুঝার কারণে তারা দুইভাবে ভ্রান্তির শিকার হচ্ছে।

এক. মুজতাহিদদের কর্ম ও সেক্যুলারদের আইনপ্রণয়নকে গুলিয়ে ফেলা। মুজতাহিদদের কাজ হলো কুরআন-সুন্নাহর প্রিন্সিপাল অনুযায়ী নতুন কোনো বিষয়ের শরয়ি হুকুম বের করা। তাদের কাজের ভিত্তি থাকে কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফদের বুঝ ও ব্যাখ্যা। সালাফদের বুঝকে পুঁজি করেই তারা ইজতিহাদ করেন। তারা নতুন নিজস্ব কোনো ব্যাখ্যার আশ্রয় নেন না এই ক্ষেত্রে। যারাই সালাফদের বুঝের বাইরে নিজস্ব ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চাইবে, তারাই সত্য পথ থেকে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

অন্য দিকে সেক্যুলারদের আইনের ভিত্তি থাকে মানবীয় প্রবৃত্তি ও বিবেক। তারা আল্লাহর হাকিমিয়্যাত প্রত্যাখ্যান করে, যাকে মহান আল্লাহ ১৩৬ জাহিলিয়্যাতের হুকুম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং মুজতাহিদদের কর্ম এবং সেক্যুলারদের আইনপ্রণয়নের মাঝে কোনো

সামঞ্জস্য নেই। উভয়ের মাঝে বরং তাওহিদ ও শিরকের সম্পর্ক। একটি ঈমান, অপরটি কুফর।

দুই. ইসলামি শরিয়তকে অপূর্ণাঙ্গ এবং অপর্যাপ্ত হিসেবে দেখানো। এমন দাবি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দেওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক। আমরা জানি আমাদের দীন কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য পালনীয় একমাত্র দীন। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই ইসলামি শরিয়তে মানবজাতির পার্থিব ও পরকালীন জীবনের সমস্ত প্রয়োজনের সমাধান ও নির্দেশনা পূর্ণরূপে থাকবে। এজন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَـٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

আমি আপনার কাছে এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক জিনিসের সুস্পষ্ট বিবরণী হিসেবে। ইমাম শাতেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ এই শরিয়তকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন, যার মাঝে মানুষের ইবাদত ও দায়িত্ব পালন এবং জীবনপরিচালনার প্রয়োজনীয় সমস্ত দিকনির্দেশনার সুস্পষ্ট বিবরণ আছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই দীনের পরিপূর্ণতা লাভের স্বীকৃতি নিয়েই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম।

সুতরাং যে ব্যক্তি মনে করবে এই দীন পূর্ণাঙ্গ নয়; পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য আরো কিছু বিষয়ের প্রয়োজন রয়েছে, সে আল্লাহর এই আয়াত অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হবে। দীন পরিপূর্ণ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, মানব- জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে শরিয়ত মৌলিকভাবে কোনো না কোনো নির্দেশনা দিয়েছে। অর্থাৎ একটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এখন এসব মূলনীতি থেকে শাখাগত বিষয়ের সমাধান খুঁজে বের করার দায়িত্ব ১৪০ মুজতাহিদদের উপর ন্যস্ত থাকবে। মনে রাখতে হবে শরিয়তের মূলনীতি মেনে মুজতাহিদগণ নব উদ্ভাবিত যেসব বিষয়ের মাসআলা বের করেন, যদিও তা বাহ্যত মানবীয় সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অবশ্যই 'বিমা আনযালাল্লাহ' (আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন) এর অন্তর্ভুক্ত; যদিও তা প্রকাশ পায় একজন মুত্তাকি মুজতাহিদের গবেষণার মাধ্যমে। কারণ, এখানে মূলনীতি মানা হচ্ছে শরিয়তকে।

আমাদের শরিয়ত পরিপূর্ণ। মানব-জীবনের এমন কোনো অধ্যায় নেই, যার ব্যাপারে শরিয়ত বৈধতা বা অবৈধতার আদেশ-নিষেধ জারি করেনি। এখন হতে পারে বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে অথবা কোনো মূলনীতির আওতায় এর আলোচনা রয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন কোনো নতুন বিষয় সামনে আসেনি, যা ইসলামের কোনো মূলনীতির আওতায় পড়েনি কিংবা তার ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম প্রয়োগ করা যায়নি। শরিয়তের নস নির্দিষ্ট; কিন্তু সেগুলো ব্যাপক। কিয়ামত পর্যন্ত যত বিষয় আসবে ও ঘটবে,

শরিয়ত সবকিছুর জন্য যথেষ্ট। এই শরিয়তে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবজাতির যেকোনো সমস্যার সমাধানের দিকনির্দেশনা রয়েছে।

সেক্যুলারিস্টদের ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ এবং যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে

ধর্মনিরপেক্ষতার হারাম ধারণা

প্রতিটি জনপদে থাকে নানা গন্তব্যে পৌঁছার নানা পথ। সঠিক গন্তব্যে পৌঁছার লক্ষ্যে অবশ্যই সঠিক পথটিকে বেছে নিতে হয়। এখানে আপোষ চলে না। এক সাথে দুই পথে চলা যায় না। তেমনি প্রতি দেশে থাকে নানা ধর্ম। বেছে নিতে হয় সঠিক ধর্মকে। এখানেও আপোষ চলে না। এক সাথে দুই ধর্মে বিশ্বাসী হওয়া যায় না। মিথ্যা ধর্ম ও মিথ্যা মতাদর্শের নানা রূপ থাকে। থাকে নানা বয়ান। সময়ের তালে ও দেশ ভেদে মিথ্যা তার রূপ পাল্টায়। তাই বাংলার মন্দিরে হিন্দুদের যেসব দেব-দেবীর মূর্তি দেখা যায়, সেসব দেব-দেবীর মূর্তি রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও গুজরাতের মন্দিরে নাই। সেখানে দেব-দেবী যেমন ভিন্ন, পূজার আচারও ভিন্ন। কিন্তু সত্যের রূপ মাত্র একটিই। সে শাশ্বত সত্যের বাণী নিয়ে একমাত্র সত্য ধর্মটি হলো ইসলাম। এই ধর্মেরই প্রথম নবী ছিলেন হযরত আদম (আ:) এবং সর্বশেষ নবী হলেন হযরত মহম্মদ (সা:)। তাদের মাঝে এক ও অভিন্ন সত্যের পয়গাম নিয়ে এসেছেন লক্ষাধিক নবী-রাসূল। প্রতি যুগে একমাত্র এই ইসলামই দেখিয়েছে জান্নাতের সঠিক পথ; সে পথটিই হলো পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত সিরাতাল মুস্তাকীম।

আলো ও আঁধারের মাঝামাঝি কিছু নাই। হয় আলো থাকবে, না হয় আঁধার থাকবে। তেমনি সত্য ও মিথ্যার মাঝামাঝি নিরপেক্ষ বলেও কিছু নাই। সত্যের পক্ষ নেয়ার মধ্যেই সততা। এবং মিথ্যার পক্ষ নেয়ার মধ্যেই পাপ ও দুর্বৃত্তি। তেমনি একটি ধর্মকে সত্য ধর্ম রূপে বিশ্বাস করলে অন্য ধর্মকে অবশ্যই মিথ্যা বলে মেনে নিতে হয়। এবং সেটি মেনে নেয়ার মধ্যেই ঈমানদারী। চরম বেঈমানী হলো মিথ্যাকে সত্যের সমকক্ষতা দেয়া। এ জন্যই ঈমানদারের জন্য অসম্ভব হয় সত্য ধর্ম ও মিথ্যা ধর্মের মাঝে নিরপেক্ষ থাকা। মিথ্যা ধর্মের পক্ষ নেয়া যেমন গুরুতর অধর্ম বা পাপ, তেমনি পরম অধর্ম বা পাপ হলো সত্য ও মিথ্যা ধর্মের মাঝে ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান নেয়া। অথচ বাংলাদেশের ন্যায় মুসলিম দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার লেবাস পড়িয়ে হাজির করা হয় সেক্যুলারিস্টদের। এবং সেক্যুলারিজমকে পেশ করা হয় ধর্মনিরপেক্ষতা বলে। এটি সত্যের সাথে নিরেট গাদ্দারী।

প্রতিটি দুর্বৃত্তিই পাপ। এবং সে পাপের নির্মূলে কোন কিছু না করাই মহাপাপ। তাতে সমাজ পাপে ভরে উঠে এবং বসবাসের অযোগ্য হয়। পাপী ও তার পাপের সামনে তাই নিরপেক্ষ সাজা যায় না। তেমনি অধর্মের বিরুদ্ধে কোন কিছু না করাই পরম অধর্ম। তখন দেশ অধর্ম

কর্মে ভরে উঠে এবং বাসের অযোগ্য হয়। ঈমানদারকে এজন্যই সকল পাপ ও সকল অর্ধের নির্মূলে আমৃত্যু জিহাদ নিয়ে বাঁচতে হয়। পৃথিবী পৃষ্ঠে এটিই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জনকল্যাণমূলক কর্ম। এবং ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। তাই প্রশ্ন হলো, প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষতার নামে অধর্মকে সহ্য করে কী করে? তাতে কি ঈমান বাঁচে? অধর্ম বা মিথ্যা ধর্মের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহতায়ালার বয়ান অতি সুস্পষ্ট।

ঈমানদার হওয়ার শর্তই হলো, ইসলামই যে সমগ্র মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে একমাত্র নির্ধারিত ধর্ম -সে সত্যকে মনেপ্রাণে মেনে নেয়া এবং তার উপর অটল থাকা। কোন রূপ সন্দেহ পোষণ করার অর্থই হলো বেঈমানী। এবং অটল বিশ্বাস থাকতে হয় এ নিয়েও যে, পবিত্র কুর’আনই হলো জান্নাতে পৌঁছার একমাত্র রোডম্যাপ। প্রতিটি দেশের প্রতিটি জনপদের মানুষের সামনে এই কুর’আনী রোডম্যাপের প্রতিষ্ঠাই হলো মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বড় কল্যাণ কর্ম। অর্থদান, গৃহদান বা চিকিৎসাদান নয়, বরং সর্বশ্রেষ্ঠ এ কল্যাণ কর্মটিই মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায়। তবে কাজ স্রেফ ওয়াজ-নসিহত ও দোয়াদরুদে হয়। বরঙ এটিই হলো পৃথিবীপৃষ্ঠে সবচেয়ে অধিক ব্যয়বহুল। এ রোডের প্রতিষ্ঠা দিতে নির্মূল করতে সকল দুর্বৃত্ত শক্তির । শুধু ওয়াজ-নসিহত নয়, একাজটি অর্থ, শ্রম, মেধা ও জানের বিপুল কুর’বানী চায়। একমাত্র এ কাজের মধ্যেই মানুষ শহীদ হয় এবং সরাসরি জান্নাতে যায়। নবীজী (সা:)’র অর্ধেকের বেশি সাহাবা এ কাজে শহীদ হয়ে গেছেন। অথচ ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের কাছে ধর্মের পক্ষে সক্রিয় হওয়াটাই সাম্প্রদায়িকতা। অনেকের কাছে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস রূপে গণ্য হয়। প্রশ্ন হলো, যুদ্ধ নিয়ে বাঁচলেই কেউ যদি জঙ্গি বা সন্ত্রাসী হয়, তবে তো সবচেয়ে বেশি শুধু মার্কিনীদের জীবনে। তাদের যুদ্ধের কোন শেষ নাই। কখনো কোরিয়া, কখনো ভিয়েতনাম, কখনো আফগানিস্তান, ইরাক ও সিরিয়া। এবং এগুলি নিজ দেশের সীমান্ত থেকে বহু হাজার মাইল দূরের অন্য মহাদেশে। ফলে এ মার্কিনীদের কি বলা যাবে? তাছাড়া যুদ্ধ তো নবীজী (সা:) ও সাহাবাদের জীবনেও যুদ্ধ ছিল। তাদেরকে তবে কী বলা যাবে? বস্তুত সেক্যুলারিস্টদের অবস্থান ও যুদ্বটি মহান আল্লাহতায়ালার এজেন্ডার বিরুদ্ধে। এজন্যই ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামে চরম অধর্ম। এটি হারাম। ইসলামের মূল এজেন্ডার বিরূদ্ধে এটি এক ঘৃণ্য শয়তানী ষড়যন্ত্র। তবে ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের অস্ত্রখানি রণাঙ্গণের কাফেরের অস্ত্রের ন্যায় কোষমুক্ত নয়, এর নাশকতা ছদ্মাবরণে।

ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আঙ্গণে যতটা প্রতারণা হয়েছে, ততটা বিশ্লেষণ হয়নি এর মূল এজেন্ডা নিয়ে। ফলে প্রকাশ পায়টি এর ইসলামবিনাশী এজেন্ডা ও ষড়যন্ত্র। এ কারণেই ধর্মনিরপেক্ষতার নাম নিয়ে বাংলাদেশের সেক্যুলারিস্টগণ বিপুল সংখ্যক মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পেরেছে। প্রপাগান্ডার জোরে যে বহু অখাদ্য, কুখাদ্য ও বাজে বিষয়ও বাজার পেতে পারে –বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার বাণিজ্য হলো তারই উদাহরণ। একজন

হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান বা নাস্তিক রাজনীতিতে নীতিহীন, পক্ষহীন ও নিষ্ক্রিয় হতে পারে। কারণ এতে তারা ধর্মচ্যুৎ হয় না। কারণ, তাদের ধর্মে রাষ্ট্র নির্মাণ ও শরিয়তী আইন-আদালতের বিধান নাই। এসব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাগণ বা নেতাগণ রাষ্ট্র নির্মাণ করেছেন, রাষ্ট্র নির্মাণে যুদ্ধ করেছেন এবং তারা নিজেরা রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন -তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। ফলে তাদের অনুসারীগণ কেন রাষ্ট্র নির্মাণে যুদ্ধ করবে? কেনই বা অর্থ ও রক্ত ব্যয় করবে? এক্ষেত্রে তারা স্বাধীন। ইসলামে যেমন শরিয়তী আইন রয়েছে, এসব ধর্মে সেরূপ কোন আইনও নাই। রাষ্ট্রের উপর তাদের উপাস্য ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের কথা তারা বলে না। ফলে তারা নিজেরা যেমন ইচ্ছামত আইন বানাতে পারে। তেমনি রাষ্ট্রের উপর নিজেদের সার্বভৌমত্বও প্রতিষ্ঠা দিতে পারে।

এসব ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান ও ইতিহাস অন্যান্য ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হযরত মহম্মদ (সা:) নিজে রাষ্ট্র নির্মাণ করেছেন এবং ১০টি বছর সে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন। ইসলাম নিয়ে বাঁচতে হলে নবী-জীবনের সে ইতিহাস চেতনায় ধারণ করে বাঁচতে হবে। মুসলিম হওয়ার শর্ত হলো, তাকে শুধু মহান আল্লাহতায়ালার হুকুম মানলে চলে না, অবশ্যই মানতে হয় তাঁর রাসূলের গুরুত্বপূর্ণ সূন্নতগুলিকেও। নবীজী (সা:) কোন কিছুই নিজের খেয়াল-খুশি মত করতেনা না। তিনি তাই করতেন, যে বিষয়ে তিনি মহান আল্লাহতায়ালা থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত হতেন। অতএব নবীজী (সা:)'র সূন্নত অনুসরণের মধ্যেই মহান আল্লাহতায়ালার অনুসরণ। সে ঘোষণাটি এসেছে সুরা নিসার ৮০ নম্বর আয়াতে। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, “মাই ইউ'তিয়ীর'রাসূলা ফাক্বাদ আতায়াল্লাহা।” অর্থ: যে অনুসরণ করলো রাসূলকে, সেই অনুসরণ করলো আল্লাহকে। তাই নবীজী (সা:)'র অবাধ্যতার অর্থ মহান আল্লাহতায়ালার অবাধ্যতা। সে অবাধ্যতা ব্যক্তিকে কাফের বানায়। এবং নবীজী (সা:)'র অনুসরণের অর্থ ইসলামী রাষ্ট্র নির্মাণ ও তাঁর রাজনীতির সূন্নতকেও পুরোপুরি অনুসরণ করা।

সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত এবং সবচেয়ে ভয়ংকর পাপ

মানব সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মটি কৃষিকাজ, পশুপালন, গৃহ নির্মাণ, সড়ক নির্মাণ, কলকারখানা নির্মাণ, শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্য নয়। এগুলো অসভ্য ও নৃশংস দুর্বৃত্তরাও করতে পারে। বরং সেটি হলো সভ্য মানব, সভ্য সমাজ ও সভ্য রাষ্ট্র নির্মাণ; এবং সে রাষ্ট্রে সকল প্রকার দুর্বৃত্তির নির্মূল ও সুবিচারের প্রতিষ্ঠা। সে লক্ষ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হলো উন্নত আইন ও ন্যায্য বিচার ব্যবস্থা। এখানেই ধরা পড়ে একটি জাতি কতটা সভ্য বা অসভ্য -সেটি। এমন রাষ্ট্রের নির্মাণ কখনো দৈবাৎ ঘটে না। এর জন্য জন্য প্রয়োজন শুধু দেশবাসীর অর্থ, শ্রম, মেধা

ও রক্তের বিনিয়োগ নয়, বরং ব্যক্তির প্রতিটি সামর্থ্যের। ইসলামে এটিই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। ইসলামে এটি জিহাদ। কারণ এখানে অর্থ, মেধা, শ্রম রক্তসহ সকল সামর্থ্যের লাগাতর বিনিয়োগ ঘটে। এই কাজটি সবচেয়ে সুন্দর ভাবে সমাধা দিতে পেরেছিলেন নবীজী (সা:) ও তাঁর সাহাবাগণ। ফলে মুসলিমগণ সেদিন হতে পেরেছিল সে আমলের সবচেয়ে শক্তিশালী বিশ্বশক্তি। এবং তাদের হাতে নির্মিত হয়েছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা। এটিই হলো, মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম। অন্য কোন নবী বা রাসূলের দ্বারা সেটি কখনোই ঘটেনি। তাই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। কোটি কোটি মানুষ নামাজ-রোজা পালন করতে পারে। কিন্তু তারা পুরাপুরি ব্যর্থ হতে পারে সভ্য রাষ্ট্র নির্মাণে। ফলে বরং চুরিডাকাতি, ভোটডাকাতি, ধর্ষণ, অর্থপাচার ও সন্ত্রাসের ন্যায় নানারূপ দুর্বৃত্তির কাজে রাষ্ট্র ভয়ানক অপরাধীদের হাতে হাতিয়ারে রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমনটি হয়েছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। তাই মানব সভ্যতার সবচেয়ে জঘন্য পাপটি চুরি-ডাকাতি ও গুম-খুন নয়, সেটি হলো সভ্যতর রাষ্ট্র নির্মাণের পথকে বাধাগ্রস্ত করা। সেক্যুলারিস্টগণ সে পাপের দিকে মানুষকে টানে। এটিই হলো শয়তানের শিবিরের মূল মিশন এবং সর্বনিকৃষ্ট পাপকর্ম। অপরাধ এখানে মানবকে নিয়ে মহান আল্লাহতায়ালার এজেন্ডাকে ব্যর্থ করে দেয়ার। এবং সে সাথে রাষ্ট্রকে জাহান্নামের বাহনে পরিণত করার।

এজন্যই নবীজী (সা:)'র সর্বশ্রেষ্ঠ সূন্নতটি নফল নামাজ, নফল রোজা, দাড়ি রাখা, মানুষকে সালাম দেয়া বা পথের কাঁটা সরানো নয়। বরং সেটি হলো, শয়তান ও তার অনুসারীদের এজেন্ডাকে ব্যর্থ করা এবং মহান আল্লাহতায়ালার এজেন্ডাকে বিজয়ী করা। সেটি ইসলামী রাষ্ট্রের নির্মাণ, রাষ্ট্রের আদালতে শরিয়ত প্রতিষ্ঠা এবং সে রাষ্ট্রের সুরক্ষায় লাগাতর জিহাদে লিপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে। মুসলিমদের দ্বারা সে কাজটি না হলে খোদ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেও বিজয়ী হয় ইসলামের শত্রুপক্ষ তথা শয়তানের অনুসারীরা। বাংলাদেশসহ অধিকাংশ মুসলিম দেশে তো সেটিই হয়েছে। অথচ নবীজী (সা:) এ পবিত্র কাজে রণাঙ্গণে আহত হয়েছেন এবং অর্ধেকের বেশি সাহাবা শহীদ হয়েছেন। নবীজী (সা:)'র ইন্তেকালের পর সাহাবাগণ তাঁর সে সূন্নতকে পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন। নবীজী (সা:)'র অন্য সকল সূন্নতের পাশাপাশি তাঁর রাজনৈতিক সূন্নতকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন খোলাফায়ে রাশেদার মধ্য দিয়ে। নবীজী (সা:)'র সে সূন্নতকে প্রতিষ্ঠা দেয়ার দায়িত্ব তো প্রতি যুগের প্রতিটি মুসলিমের।

পবিত্র কুর'আনের ঘোষণা, "যারা নবীজী (সা:)কে অনুসরণ করে তারাই অনুসরণ করে আল্লাহকে।" -(সুরা নিসা, আয়াত ৮০)। এবং যারা বাঁচে সে অনুসরণ, নিয়ে তারাই চলে সিরাতাল মুস্তাকীমে। তাই নবীজী (সা:)'র সূন্নত থেকে বিচ্যুৎ হওয়ার অর্থ সিরাতাল মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত হওয়া। বিদ্রোহ এখানে খোদ মহান আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধে। বিদ্রোহের পথ তো শয়তানের পথ। সে পথ জাহান্নামের। মুসলিম বিশ্ব আজ বিদ্রোহে ভরপর। বিদ্রোহ এখান আল্লাহতায়ালার হুকুম ও নবীজী (সা:)'র সূন্নতের বিরুদ্ধে। সে বিদ্রোহেরই নমুনা হলো, বেঁচে

নাই ইসলামী রাষ্ট্র, আদালতে নাই শরিয়তী আইন, স্কুল-কলেজে নাই কুর'আনী জ্ঞানের চর্চা, নাই প্যান-ইসলামিক মুসলিম ভ্রাতৃত্ব এবং নাই দুর্বৃত্ত নির্মূল ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জিহাদ। এরপরও কি বিশ্বাস করা যায়, মুসলিমগণ চলছে সিরাতাল মুস্তাকীম বেয়ে? ইসলামী রাষ্ট্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এরূপ নিষ্ক্রিয় থেকে শয়তানের সেক্যুলারিস্ট ও পৌত্তলিক সৈনিকদের খুশি করা যায়। কিন্তু তা দিয়ে কি মহান আল্লাহতায়ালা খুশি করা যায়?

পবিত্র কুর'আনে ঘোষিত মানুষের পরিচয় হলো, সে মহান আল্লাহতায়ালার খলিফা তথা প্রতিনিধি। খলিফা বা প্রতিনিধির সার্বভৌম হওয়ার অধিকার থাকে না। সেটি তার জন্য হারাম। এখানেই ইসলামের "রেড লাইন"। এ "রেড লাইন" অতিক্রম করার অর্থ ইসলামের রশিকে গলা থেকে ছুঁড়ে ফেলা। অথচ বাঙালি মুসলিমগণ সে রেড লাইন বহু আগেই অতিক্রম করেছে। তারা দেশের শাসনতন্ত্রে নিজেদের সার্বভৌম রূপে ঘোষণা দিয়েছেন। এটি হলো সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধে বাঙালি মুসলিমদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। সার্বভৌম হওয়ার অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালার। মানুষ নিজে আইন বানাবে না, বরং মেনে চলবে একমাত্র মহান আল্লাহতয়ালার আইন। আদালতের বিচার-আচার করবে শরিয়তী আইন অনুযায়ী। খোলাফায়ে রাশেদার আমলে সাহাবাগণ তো সে ভাবেই বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন। যে বিষয়ে শরিয়তের আইন রয়েছে, সে বিষয়ে আইন রচনা করা হারাম। বাংলাদেশের এই শাসনতন্ত্র ইসলামপন্থীদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছে। কারণ, কোন দলকে আইনগত বৈধতা পেতে হলে শাসনতন্ত্রের এই হারাম বিধির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। শরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে এমন কেউ কি সেটি করতে পারে?

এ পৃথিবীপৃষ্ঠে ঈমানদারের ভূমিকাটি বিশাল। সে কখনোই কোন রাষ্ট্রের নীরব ও নিষ্ক্রিয় প্রজা নয়। বরং সে হলো বিশ্বজাহানের মালিক মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে দায়প্রাপ্ত খলিফা। তাঁর খলিফা রূপে ইসলামী রাষ্ট্রের সক্রিয় নির্মাতা ও রক্ষক হওয়াই তার মূল দায়িত্ব। সে শুধু রাষ্ট্রের বুকে মহান আল্লাহতায়ালার সার্বভৌমত্ব ও তাঁর শরিয়তী আইনের প্রতিষ্ঠা দেয়ার জিহাদে অংশ নেয় না, বরং সে রাষ্ট্রের সুরক্ষাও নিজের মেধা, শ্রম, অর্থ ও রক্তের বিনিয়োগ করে। নবীজী (সা:) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের জীবনের সবচেয়ে বড় অংশ ব্যয় হয়েছে ইসলামের এ শিক্ষাটি হাতে-কলমে শেখাতে।

এ পৃথিবীপৃষ্ঠে ঈমানদারের ভূমিকাটি বিশাল। সে কখনোই কোন রাষ্ট্রের নীরব ও নিষ্ক্রিয় প্রজা নয়। বরং সে হলো বিশ্বজাহানের মালিক মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে দায়প্রাপ্ত খলিফা। তাঁর খলিফা রূপে ইসলামী রাষ্ট্রের সক্রিয় নির্মাতা ও রক্ষক হওয়াই তার মূল দায়িত্ব। সে শুধু রাষ্ট্রের বুকে মহান আল্লাহতায়ালার সার্বভৌমত্ব ও তাঁর শরিয়তী আইনের প্রতিষ্ঠা দেয়ার জিহাদে অংশ নেয় না, বরং সে রাষ্ট্রের সুরক্ষাও নিজের মেধা, শ্রম, অর্থ ও রক্তের বিনিয়োগ করে।

নবীজী (সা:) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের জীবনের সবচেয়ে বড় অংশ ব্যয় হয়েছে ইসলামের এ শিক্ষাটি হাতে-কলমে শেখাতে।

পবিত্র কুর'আনে হক্ক তথা সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং বাতিল তথা মিথ্যার নির্মূলের হুকুম বার বার এসেছে। কিন্তু একটি বারও ধর্ম প্রসঙ্গে নিরপেক্ষ থাকার হুকুম আসেনি। বরং মুসলিম জীবনের যাত্রা শুরু হয় ইসলামের পক্ষ নেয়ার মধ্য দিয়েই। সেটি হক্কের পক্ষে এবং মিথ্যার বিপক্ষে। তাই ইসলাম ও অনৈসলাম এবং ধর্ম ও অধর্মের মাঝে নিরপেক্ষ থাকা একজন মুসলিমের পক্ষে অসম্ভব। মৃতদের কোন পক্ষ থাকে না, তেমনি থাকে না ঈমানহীন বেঈমানদেরও। মৃত্যুটি এখানে ঈমানের।

ষড়যন্ত্রটি ইসলামকে শক্তিহীন করায়

ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের যুক্তি, রাষ্ট্রে ইসলামের প্রতিষ্ঠা দিলে অন্য ধর্মের স্বার্থহানী হয় ও সে ধর্মের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব হয়। কিন্তু সে যুক্তি একজন মুসলিম মেনে নেয় কি করে? ইসলাম এসেছে মিথ্যা ধর্মের জাহিলিয়াত সরিয়ে কুর'আনী সত্যের প্রতিষ্ঠা দিতে। আবর্জনার সাথে নিরপেক্ষতা চলে। পরিচ্ছন্ন পরিবেশের নির্মাণে আবর্জনার নির্মূলে আপোষহীন হতে হয়। একই রূপ নীতি মিথ্যা ধর্ম ও মিথ্যা মতাদর্শের ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হওয়ার সুযোগ নাই। মিথ্যার নির্মূলে আপোষহীন হওয়া এজন্যই ঈমানদার হওয়ার শর্ত। নইলে বেঈমানী হয় সত্যের সাথে। সেরূপ আপোষহীনতা না থাকলে নবীজী (সা:) কি ক্বাবার ভিতর থেকে মূর্তিগুলিকে সরাতে পারতেন? পৌত্তলিকতার নির্মূলে আপোষহীন না হলে ৩৬০টি মূর্তি এবং মূর্তিপূজা বেঁচে থাকতো ক্বাবার মধ্যে। বিষয়টি অবিকল অভিন্ন শরিয়তকে প্রতিষ্ঠা দেয়ার ক্ষেত্রেও। প্রতিটি ঈমানদারের দায়বদ্ধতাটি এখানে খোদ মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি। অন্য ধর্মের অনুসারীদের খুশি করতে গিয়ে কোন ঈমানদারই তাঁর মা'বুদের পক্ষ থেকে অর্পিত দায়ভার পালনে সামান্যতম অবহেলা দেখাতে পারে না। দায়িত্ব পালনে অবহেলা ব্যক্তিকে মুনাফিক বানায়। মুসলিম মাত্রই খলিফা মহান আল্লাহতায়ালার; তাই তাকে প্রতি মুহুর্ত বাঁচতে হয় খেলাফতের দায়িত্বপালন নিয়ে। সে দায়িত্বপালনে অবহেলার শাস্তি জাহান্নামের আগুন। তখন কোন অমুসলিমই তার কোন কাজে আসবে না।

অন্ধকার বিলুপ্ত হবে –এ যুক্তি দেখিয়ে কি কখনো অন্ধকার বাঁচিয়ে রাখা এবং আলো জ্বালানোর কাজে বাধা সৃষ্টি করা যায়? এটি তো অন্ধকারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। তাই অন্য ধর্মের স্বার্থহানী হবে -এই যুক্তিতে কি ইসলামের প্রতিষ্ঠার কাজে সামান্যতম অবহেলা দেখানো যায়? এটি কি নিরপেক্ষতা? এটি সত্যের পক্ষ ছেড়ে অসত্যের পক্ষ নেয়া। ধর্মনিরপেক্ষবাদীগণ সেটিই করছে।

অথচ মহান আল্লাহতায়ালার কাছে ইসলাম ভিন্ন অন্য ধর্মগুলি কোন ধর্মই নয়। এগুলি নিরেট মিথ্যাচার। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহতয়ালার ঘোষণা: "ইন্না দ্বীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম।" অর্থ: আল্লাহর কাছে একমাত্র ধর্ম হলো ইসলাম। ধর্মীয় বিধানে নানা রূপ মিথ্যা যোগ করার কারণে খৃষ্টান ধর্ম ও ইহুদী ধর্মের অনুসারীগণ আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও সত্যের উপর বেঁচে নাই। তারা পথভ্রষ্টদের দলে।

রাষ্ট্রের অঙ্গণ থেকে ইসলামকে দূরে রাখার স্বার্থে তারা এ কথাও বলে, সাড়ে চৌদ্দ শত বছর পূর্বে ইসলামের যেরূপ প্রতিষ্ঠা দেয়া সম্ভব হয়েছিল, এখন সেটি সম্ভব নয়। তাদের যুক্তি, সময় অনেক সামনে এগিয়েছে, রাষ্ট্রকে নতুন ভাবে গড়তে হবে। এ যুক্তি সেক্যুলারিস্টদের। মুসলিমদের কাছে এ যুক্তির কোন মূল্য নাই। মুসলিম নির্দেশনা নেয় একমাত্র কুর'আন ও হাদীস থেকে। কুর'আন-হাদীসের কোথাও কি বলা আছে যে, সাড়ে চৌদ্দ শত বছর পর ইসলামের বিধানগুলি অচল? অনুমতি দেয় কি শরিয়ত বাদ দিয়ে অন্য আইন অনুসরণের। তাছাড়া সময়ের তালে সত্য কখনোই মিথ্যা হয় না এবং মিথ্যা কখনোই সত্যে পরিণত হয় না। নবীজী (সা:)র পর সাড়ে চৌদ্দশত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এতো দীর্ঘকাল পরও চুরি-ডাকাতি, সূদ, ঘুষ, জ্বিনা, ধর্ষন, হত্যার ন্যায় অপরাধগুলিও নেক কর্মে পরিনত হয়নি। সেগুলি আজও অপরাধ রূপেই গণ্য হচ্ছে। ফলে সে অপরাধগুলির বিরুদ্ধে শাস্তির বিধানগুলিই বা অচল হবে কেন? মহান আল্লাহতায়ালার বিধান মেনে যদি আজও চন্দ্র-সূর্য, দিবা-রাত্র ও জোয়ার-ভাটা চলতে পারে, তবে মানবের জীবন ও রাষ্ট্র কেন তাঁর বিধান অনুযায়ী চলতে পারে না?

ধর্মনিরপেক্ষবাদীগণ নিজেদের পক্ষে পবিত্র কুর'আনের আয়াত "লাকুম দ্বীনাকুম ওয়ালিয়া দ্বীন" পেশ করে। অর্থ: তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম। লক্ষণীয় হলো, এ আয়াতে নিরপেক্ষতার কথা নাই, বরং আছে নিজ ধর্মে অটল থাকার কথা। বলা হয়েছে, "আমাদের জন্য আমাদের দ্বীন।" অর্থাৎ দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে আপোষের বা নিরপেক্ষতার স্থান নাই। দ্বীন বা ধর্ম বলতে ইসলাম যা পেশ করে সেটি শুধু নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত নয়। বরং সে দ্বীনপালনের মধ্যে রয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রের নির্মাণ, কুর'আন-হাদীস শিক্ষা, শরিয়তী আইনের বিচার, দুবৃত্তির নির্মূলে জিহাদ, শুরা ভিত্তিক শাসন এবং প্যান-ইসলামিক মুসলিম ঐক্য।

"লা ইকরাহা ফিদ্দীন" অর্থাৎ ধর্মে জবরদস্তি নাই। ধর্মনিরপেক্ষবাদীগণ নিজেদের পক্ষে পবিত্র কুর'আনের এ আয়াতটিও পেশ করে। এই আয়াতে ইসলামের প্রচারে শক্তির প্রয়োগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু নিজ জীবনে দ্বীনের হুকুম পালনে শিথিল বা আপোষমুখী হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। বরং পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে "উদখুলু ফিস সিলমি কা'ফফা" অর্থ: ইসলামের

মধ্যে পুরোপুরি দাখিল হয়ে যাও। এখানে হুকুম হলো, পূর্ণ মুসলিম হওয়ার। পূর্ণ মুসলিম কি ভাবে হতে হয় সেটি নবীজী (সা:) দেখিয়ে গেছেন। পূর্ণ মুসলিম হতে হলে শুধু কালেমা পাঠ, নামাজ-রোজা ও হজ্জ-যাকাত পালন করলে চলে না। স্রেফ মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করলেও চলেনা। পূর্ণ ইসলাম পালনের যে চিত্রটি নবীজী (সা:) স্থাপন করে গেছেন সেভাবে ইসলাম পালন করতে হয়। তখন ইসলামী রাষ্ট্র, শরিয়তী আদালত, দুর্বৃত্তির নির্মূল, সুবিচারের প্রতিষ্ঠা, শুরা ভিত্তিক শাসন, মুসলিম ঐক্য এবং জিহাদও এসে যায়। প্রশ্ন হলো, এর কোন একটিকে বাদ দিয়ে কি পূর্ণ ইসলাম পালন হয়? পূর্ণ ইসলাম পালন ছাড়া কি কখনো পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হওয়া যায়? আজকের মুসলিমদের মূল সমস্যা তো এখানেই। তারা ব্যর্থ হচ্ছে পূর্ণ ইসলাম পালনে। সেক্যুলারিস্টগণও সেটিই চায়।

যুদ্ধটি ইসলামের মূল এজেন্ডার বিরুদ্ধে

ইসলামের মিশনটি যেমন বিশাল, তেমনি বিপ্লবীও। মিশনটি সমগ্র বিশ্ববাসীকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসার। মিশন যেমন জান্নাতের উপযোগী মানুষ গড়ার, তেমনি সে কাজে সহায়ক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার। মুসলিম হওয়ার অর্থই হলো: ইসলামের সে মিশনকে নিয়ে বাঁচার। জান্নাতের উপযোগী সে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রগড়ার কাজটি কখনোই কোন জঙ্গলে বা জনশূণ্য স্থানে হয় না। ইসলাম সেকাজে একটি পদ্ধতিরও প্রতিষ্ঠা দেয়। সেটিই হলো পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত সিরাতাল মুস্তাকীম। তাই প্রতিটি মুসলিমকে অবশ্যই বাঁচতে হয় সে পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। পবিত্র কুর'আনের জ্ঞান, নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জিহাদের ন্যায় ইবাদত বস্তুত সেটিরই অংশ। কীভাবে সে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের সে জিহাদ নিয়ে বাঁচতে হয় – নবীজী (সা:) সেটিই হাতে-কলমে শিখিয়ে গেছেন। সে জিহাদের মধ্য দিয়েই ইসলামের বিজয় এসেছে এবং মুসলিমগণ বেড়ে উঠেছে বিশ্বশক্তি রূপে।

সফলতা যেহেতু একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালার হাতে, ঈমানদার তাই সফলতার পুরস্কার নিয়ে ভাবে না। বরং ভাবে নিজের বাঁচাটি কতটা তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার নিয়েত ও জিহাদ নিয়ে হলো –তা নিয়ে। আখেরাতে পুরস্কার পাবে সে নিয়েত ও জিহাদ নিয়ে বাঁচার কারণে। তাই যারা শুধু নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত এবং তাসবিহ-তাহলিল নিয়ে বাঁচে এবং দূরে থাকে ইসলামকে বিজয়ী করার জিহাদ থেকে, বুঝতে হবে তারা ইসলামের মূল মিশনই বুঝতে পারিনি। মহান নবীজী (সা:) ও সাহাবায়ে কেরামদের জীবন থেকেও তারা তেমন কিছু শিখতে পারিনি। ইসলামের গৌরব যুগে মুসলিমগণ শুধু ইসলামী চেতনাসমৃদ্ধ নারী-পুরুষ, পরিবার ও সমাজই গড়েননি। নির্মাণ করছেন শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী সভ্যতা। এমন কাজে বিরামহীন যুদ্ধ নিয়ে বাঁচাই মুসলিম জীবনের মিশন। এ জন্য চাই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্ঠা। গড়ে তুলতে হয় ইসলামের পক্ষে প্রবল একটি লড়াকু পক্ষ। নিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয় লোকদের দিয়ে

কি সেটি সম্ভব? এমন প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতার ছবক দেয়ার অর্থ, ইসলামের পক্ষ থেকে মুসলিমদের দূরে সরানো। ষড়যন্ত্রটি এখানে ইসলামের মূল এজেন্ডাকে ব্যর্থ করে দেয়ার।

মুসলিমদের পতনটি হঠাৎ শুরু হয়নি। পতনের শুরু তখন থেকেই যখন মুসলিমগণ ইসলামের পক্ষ ছেড়ে শত্রু পক্ষে অবস্থান নেয়া শুরু করে। ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার সে কাজটি হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে। ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে সেক্যুলারিস্টগণ নিজেরাই একটি পক্ষ খাড়া করে। সেটিই হলো ইসলামের প্রতিপক্ষ। এদের দেখা গেছে কাফিরদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে। নিরপেক্ষ থাকাটি ইসলামে হারাম। ঈমান আনার সাথে সাথে প্রতিটি মুসলিমকে ইসলামের পক্ষ নিতে হয়। ফলে ঈমান আনার সাথে সাথে ব্যক্তির শুধু ধর্মেরই পরিবর্তন হয় না, তারা দলের বা পক্ষেরও পরিবর্তন হয়। মহান আল্লাহতায়ালা চান, প্রতিটি মানুষ অবশ্যই সত্যের পক্ষ নিবে। এবং বীরবিক্রমে খাড়া হবে মিথ্যা ও দুর্বৃত্তির নির্মূলে। মহান সাহাবাদের জীবনে সেটিই দেখা গেছে।

মানুষের ঈমানের ও বিবেকের পরীক্ষা শুরু হয়, সে কোন পক্ষে দাঁড়ালো বা কার পক্ষে লড়াই করলো -তা থেকে। ব্যক্তির ঈমান তখনই দৃশ্যময় হয়। যেখানেই কোন জনগোষ্ঠি একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা দেয়, সেখানেই কিছু লোক বাঁচে মিথ্যা ও দুর্বৃত্তি নিয়ে। ঈমানদার বাঁচবে সে মিথ্যা ও দুর্বৃত্তির নির্মূলে জিহাদ নিয়ে। মানব জাতির মাঝে প্রতিদ্বন্দি পক্ষ মাত্র দুটি: একটি সত্যের, অপরটি মিথ্যার। সত্যের পক্ষ মহান আল্লাহতায়ালার, মিথ্যার পক্ষটি শয়তানের। মানুষের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিচার হয় সত্যের পক্ষটি বেছে নেয়ার সামর্থ্য দেখে। অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামে যাবে মানব-হত্যা, চুরি-ডাকাতি, ধর্ষণ এরূপ অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে নয়। বরং সত্যকে চেনা এবং সত্যের পক্ষ নেয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়ার কারণে। যারাই ইসলামের বিপক্ষে, বুঝতে হবে তারাই নিশ্চিত শয়তানের পক্ষ। তাই মিথ্যা ও দুর্বৃত্তির নির্মূল এবং সত্য ও সুবিচারের প্রতিষ্ঠা যেখানে ইসলামের মিশন, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে নিষ্ক্রিয় ও নিরপেক্ষ থাকাটি কখনোই ঈমানদারের নীতি হতে পারে না।

মুসলিমদের অন্তরে দ্বীন বিকৃত ও বিনষ্ট করার জন্য সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

মুসলিমদের দ্বীন বিকৃত করার নিমিত্তে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে থাকে, যেমন:

১. দুর্বল প্রকৃতি ও দোদুল্যমান ঈমানদার লোকদেরকে সম্পদ ও পদের প্রলোভন দেওয়া, অথবা নারীর টোপ দেওয়া, যেন তারা সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী ও শ্লোগান মানুষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাতে ও প্রচার করতে পারে। অবশ্য তার পূর্বেই তারা তাদের প্রতারণার শিকার লোকদেরকে বিভিন্ন মিডিয়ায়, যেগুলোতে তাদের কর্তৃত্ব রয়েছে,

সেগুলোতে এমনভাবে তুলে ধরে যেন মানুষ তাদেরকে আলেম, চিন্তাবিদ ও প্রচুর জান্তা হিসেবে জানে এবং সাধারণ লোকদের নিকট তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, অতঃপর তাদের দ্বারা সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচার করায়, এভাবে তারা অনেক মানুষকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়।

২. কতিপয় লোককে তারা পাশ্চাত্য দেশে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদীদের আশ্রমে লালন করে এবং তাদেরকে একাডেমিক বিভিন্ন নামী-দামী পদবি প্রদান করে, যেমন 'ডক্টরেট' অথবা 'প্রফেসর' ইত্যাদি। অতঃপর সেখান থেকে প্রর্ত্যাবর্তন করার পর দ্বীনকে বিকৃত ও ভিন্নভাবে উপস্থাপনের জন্য তাদেরকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে তাদের অস্তিত্ব কতটুকুন ক্ষতিকর; অথচ তারাই সুশীল নামে খ্যাত, স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটির কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তাদের হাতেই ন্যাস্ত।

৩. এ মতবাদে বিশ্বাসী লোকদের অপর একটি কূটকৌশল হচ্ছে, দ্বীন বা ধর্মকে বিভক্ত করা, তার নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সমালোচনা ও লেখা-লেখি করা এবং মানুষদেরকে তাতে ব্যস্ত রাখা। এ লক্ষ্যে তারা দীনি ছাত্র, ধর্মীয় আলেম ও ইসলামের দিকে আহ্বানকারী দা'ঈদের সাথে অযথা তর্কে লিপ্ত হয়, যেন তারা মানুষদেরকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপদেশ-নসিহত প্রদানের পরিবর্তে তর্কে ব্যস্ত থাকে।

৪. দীনি আলেম, ধর্মীয় ছাত্র ও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী দা'ঈদেরকে রেডিও-টেলিভিশন ও বিভিন্ন মিডিয়ায় পশ্চাৎগামী, চারিত্রিকভাবে অধঃপতিত ও দ্বিতীয় শ্রেণির লোক হিসেবে উপস্থাপন করা। আরো প্রচার করা যে, তারা পদ, সম্পদ ও নারী লোভী, যেন মানুষেরা তাদের কথায় বিশ্বাস না করে ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচারের ময়দান উন্মুক্ত হয়।

৫. বিরোধপূর্ণ মাসআলা ও আলেমদের ইখতিলাফ নিয়ে বেশী আলোচনা করা, যেন মানুষ জানে দ্বীন মতবিরোধের স্থান এবং দীনি আলেমদের মাঝে কোনো ঐক্য নেই। এভাবে মানুষ বিশ্বাস করতে শিখবে যে, দ্বীনের কোনো বিষয় অকাট্য ও চূড়ান্ত নয়, অন্যথায় এতো বিরোধ সংগঠিত হত না। ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীরা এ দিকটার প্রতি খুব গুরুত্বারোপ করে। মুসলিম সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার কুপ্রভাব ছড়ানোর লক্ষ্যে এ জাতীয় বিষয়কে তারা বড় আকারে পেশ করে, যার অর্থ মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে দূরে রাখা।

৬. পাশ্চাত্য দেশসমূহের আদলে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি ও অপরিচিত কালচার সেন্টার নির্মাণ করা। এসব প্রতিষ্ঠান মুসলিম দেশে নির্মিত হলেও পরিচালিত হয় প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে। ইসলামের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক দুর্বল করার লক্ষ্যে তারা চেষ্টার ত্রুটি করে না। একই সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষবাষ্প ছড়ানোর কাজও করে ব্যাপকভাবে, বিশেষ করে সামাজিক, দার্শনিক ও মনোবিদ্যা বিভাগে তাদের পদচারণা ও প্রচারণা খুব বেশী।

৭. শরীয়তের কতক বিধান, যার প্রয়োগ ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ও সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি রয়েছে, তার উপর স্থানকাল-পাত্র ও বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করে অন্ধভাবে জমে থাকা। এভাবে তারা শরীয়তের ভুল ও বিকৃত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে ধর্মনিরপেক্ষতা বা তার অধিকাংশ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে।

উদাহরণত শরীয়তের একটি নীতি রয়েছে: 'মাসালেহে মুরসালাহ' (জনস্বার্থ), এ নীতিকে তারা উল্টোভাবে বুঝে ও ভুল পথে প্রয়োগ করে, অতঃপর তার দোহাই দিয়ে ইসলামের যে অংশ তারা পছন্দ করে না তা প্রত্যাখ্যান করে ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিধানগুলো বাস্তবায়ন করে, যেকারণে মুসলিম দেশে ধীরেধীরে ধর্মনিরপেক্ষতা শক্তিশালী ও তার ভিত্তিসমূহ মজবুত হচ্ছে।

অনুরূপ শরীয়তের আর একটি নীতি রয়েছে: "দু'টি ক্ষতিকর বস্তু থেকে কম ক্ষতিকর বস্তু ও দু'টি ফেতনা থেকে ছোট ফেতনাকে গ্রহণ কর"। আরেকটি নীতি রয়েছে: "প্রয়োজন নিষিদ্ধ বস্তুকেও বৈধতা প্রদান করে"। আরেকটি নীতি রয়েছে: "ফায়দা হাসিল করার চেয়ে ক্ষতি দূর করাই অধিক শ্রেয়"। অনুরূপ একটি নীতি হচ্ছে: "ইসলাম সর্বযুগে উপযোগী"। আরেকটি নীতি রয়েছে: "অবস্থার ভিন্নতার ভিত্তিতে ফতোয়া ভিন্ন হয়"। এ জাতীয় নীতিকে তারা গলদভাবে প্রয়োগ করে অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের সাথে ইসলামকে গুলিয়ে ফেলে ও মুসলিমদের ধোঁকা দেয়।

অনুরূপ এসব নীতিকে তারা কাফেরদের দেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক বিধান, রাজনৈতিক ভাবনা ও দর্শনকে মুসলিম দেশে আমদানি করার হাতিয়ার হিসেবে গলদভাবে প্রয়োগ করে, যেন অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত অবস্থা না জেনে বদ্দীন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমার দৃষ্টিতে তাদের এ কৌশল সবচেয়ে বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর, কারণ এতে মানুষ সন্দেহ ও ধোঁকায় পতিত হয়, তারা ভাবে এসব তো শরয়ীতের নীতি ও ইসলামের নিকট স্বীকৃত।

তাদের এ কৌশলের মুখোশ উন্মোচনের জন্য স্বতন্ত্র কিতাব প্রয়োজন, তবেই দ্বীন থেকে সন্দেহ ও অস্পষ্টতা দূর করা সম্ভব হবে এবং মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝানো যাবে।
এখানে আমরা স্পষ্ট করতে চাই যে, এ জাতীয় নীতির উপর তাদের ভরসা করার অর্থ এ নয় যে, তারা ইসলামের এসব নীতিতে বিশ্বাসী। আবার এ অর্থও নয় যে, যে-উৎস থেকে এসব বিধান এসেছে, সে ইসলামের ব্যাপ্তি, ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতার উপর তাদের ঈমান রয়েছে, বরং এসব তাদের একটি বাহানা, এভাবে তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য ও ভ্রান্ত মতবাদ বাস্তবায়ন করতে চায়।

সেক্যলারিজমের সৃষ্ট মহাবিপদ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ধর্ম প্রসঙ্গে নিরপেক্ষ থাকার কথা বললেও তারা আদৌ নিরপেক্ষ নয়। বরং বাংলাদেশের মত মুসলিম দেশগুলিতে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের পক্ষপাতদুষ্টতা অতি প্রকট। তারা যুদ্ধবাজ। তাদের যুদ্ধটি সর্বত্রই ইসলামের বিরুদ্ধে। তুরস্ক, মিশর, তিউনিসিয়া, বাংলাদেশসহ যেখানেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ক্ষমতায় গেছে. সেখানেই তারা যুদ্ধ শুরু করেছে ইসলামপন্থীদের নির্মূলে। তুরস্ক, মিশর, তিউনিসিয়ার ন্যায় দেশে তারা মদকে পানির ন্যায় অবাধ করেছে। হিজাবকে নিষিদ্ধ করেছে। এ দেশগুলি প্রণয়ন করেছে শরিয়ত বিরোধী আইন। তিউনিসিয়ার হাবিব বারগুইবা'র সরকার উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টনে পুত্র ও কন্যার মাঝে সমান অংশের নীতি চালু করে। পুরুষের একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ করে। অশ্লিলতাকে সংস্কৃতি রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠা দিয়েছে মূর্তি নির্মাণের পৌত্তলিক সংস্কৃতিকে। তুরস্কের রাস্তা ঘাটে তাই কামাল পাশার মূর্তির ছড়াছড়ি। নিষিদ্ধ করেছে আরবীতে আযান। শত শত মাদ্রাসাকে বন্ধ করে দিয়েছে। এই সেক্যুলারিস্টগণই বাংলাদেশে শেখ মুজিবের অসংখ্য মূর্তি গড়েছে। শত শত আলেমকে তারা নির্যাতন-কেন্দ্রে বন্দী করেছে। নিয়ন্ত্রিত করছে পবিত্র কুর'আনের তাফসির। এভাবে ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের প্রবল অবস্থান যেখানে পৌত্তলিকতার পক্ষে এবং ইসলামের মৌল শিক্ষার বিরুদ্ধে, সেখানে তাদের নিরপেক্ষতা কোথায়?

বাংলাদেশী ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের পক্ষপাতদুষ্টতা ধরা পড়ে তাদের বিদেশ নীতিতেও। কোন মুসলিম দেশের সাথেই তাদের এতো বন্ধুত্ব নাই -যেমনটি দেখা যায় হিন্দুত্ববাদী ভারতের সাথে। লক্ষণীয় হলো, বাংলাদেশে যারা সেক্যুলারিস্ট তাদের অধিকাংশই ভারতপন্থী। তথাকথিত এ ধর্মনিরপেক্ষবাদীগণ পৃথিবীর যে কোন দেশের বিরুদ্ধে সমালোচনা সহ্য করতে রাজী, কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে নয়। ভারতের নিন্দা করলে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদের এই সেবাদাসদের হাতে নির্মম ভাবে লাশ হতে হয় -যেমনটি হয়েছে বুয়েটের নিরীহ ছাত্র আবরার ফাহাদ। ভারতের মুসলিমদের বিরুদ্ধে গণহত্যা, গণধর্ষণ ও গণলুট হলেও বাংলাদেশের

ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা তার নিন্দা করে না। ভারতের মজলুম মুসলিমদের পক্ষে কথা বলাও তাদের কাছে সাম্প্রদায়িকতা। ভারতের সাথে সম্পর্ককে তারা গুরুত্ব দেয় এবং উপেক্ষা করে মজলুম মুসলিমের আর্তনাদ। বাবরী মসজিদের ন্যায় ঐতিহাসিক মসজিদ যখন ধুলিস্যাৎ করা হলো, তখনও বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা সেটির নিন্দা করেনি। এটি আদৌ ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, বরং বিবেকশূন্যতা।

পবিত্র কুর'আনের জ্ঞান থেকেই ব্যক্তি তার বিবেকে পুষ্টি পায়। পরিশুদ্ধি পায় চেতনায়। এই কুর'আনী জ্ঞানের সরবরাহ বন্ধ হলে মৃত্যু ঘটে বিবেকের। তখন মৃত বিবেকের মানুষ ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম এবং সত্য-মিথ্যার মাঝে তারতম্য করার সামর্থ্য হারায়। তখন মূর্তিপূজা, গরুপূজা, লিঙ্গপূজা, যীশুপূজা এবং বৌদ্ধপূজাও ধর্মকর্ম মনে হয়। এজন্যই পবিত্র কুর'আন থেকে মানুষ যতই দূরে সরে ততই সে বিবেকশূন্য ও ধর্মশূন্য হয়। তাই গুরুতর অপরাধটি স্রেফ অর্থাভাব বা দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি নয়, বরং সেটি হলো কুর'আনী জ্ঞানের শূন্যতা সৃষ্টি। অথচ সেক্যুলারিস্টগণ সে ভয়ানক অপরাধ কর্মটি করে ইসলাম থেকে দূরে সরানোর মধ্য দিয়ে। দুবৃত্তায়নের এটিই হলো সবচেয়ে সফল প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে সেটিই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে। এবং সেটি হচ্ছে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। তাই ভারতের সেক্যুলারিস্টগণ যেমন সেদেশে হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম-নির্মূল প্রকল্প রোধে আগ্রহ দেখায় না, তেমনি অবস্থা বাংলাদেশী সেক্যুলারিস্টদের। এটিই হলো নিহত বিবেকের লক্ষণ। লক্ষণীয় হলো বাংলাদেশে যতই প্রবলতর হচ্ছে সেক্যুলারিজমের জোয়ার, ততই বাড়ছে গুম, খুন, চুরিডাকাতি, ভোটডাকাতি, সন্ত্রাস, ধর্ষণ ও স্বৈরাচারের তান্ডব।অথচ বাংলাদেশের মত যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম সে দেশের মানুষ মহান আল্লাহতায়ালার নির্দেশিত সিরাতাল মুস্তাকীম অনুসরণ করে গৌরবযুগের মুসলিমদের ন্যায় শান্তি, সমৃদ্ধি, ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় ইতিহাস গড়বে -সেটিই তো কাঙ্খিত ছিল। কিন্তু সেটি হয়নি। কারণ, অতীতে মুসলিমগণ বিজয় ও গৌরব পেয়েছে কুর'আনী রোডম্যাপ তথা সিরাতাল মুস্তাকীম অনুসরণ করে। অথচ আজ সে পথ অনুসরণের বদলে তা থেকে দূরে সরার কাজটিই বেশি হয়েছে। সেটি হয়েছে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে। তাই মানব ইতিহাসে সেক্যুলারিজম হাজির হয়েছে ভয়ানক রোগ রূপে। এ রোগের নাশকতা কোভিড বা অন্য যে কোন ভয়ানক রোগের মহামারী থেকেও অধিক ভয়ানক। দৈহিক রোগ মানুষকে বিবেকহীন, ঈমানহীন ও ইসলামের শত্রুতে পরিণত করে না। ফলে জাহান্নামেও নেয় না। কিন্তু সে ভয়ানক বিপদ ঘটায় সেক্যুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা। সেক্যুলারিজমের মূল বিপদটি এখানেই।

- স্যাকুলারিজম কি মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য?

পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে স্যাকুলারিজম বা ধর্মহীনতা বিকাশের কোনো কারণ যদি থেকেও থাকে কোনো মুসলিম দেশে তা বিকাশের কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। কেননা কোনো খ্রিস্টানকে যখন মানবরচিত সিভিল ল' দিয়ে শাসন করা হয় তখন সে অল্প বা বিস্তর বিরক্ত হয় না। কারণ এতে করে সে এমন কোনো কিছুকে অকেজো করছে না যা মান্য করা তার ধর্ম তার উপর আবশ্যক করে দিয়েছে; কেননা তাঁর ধর্মে জীবনবিধান হিসেবে কিছু নেই। কিন্তু মুসলিমের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। মুসলিমের ঈমানই তাঁকে আল্লাহর আইনের শাসন গ্রহণে বাধ্য করে। তাছাড়া যেমন ড. ইউসুফ আল-কারাদাভী বলেন- ধর্ম থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন রাখা হলেও খ্রিস্টান ধর্ম তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাতে অটুট থাকবে এবং খ্রিস্টান ধর্মরক্ষী পোপ, ফাদার, মাদার ও ধর্মপ্রচারকগণ বিনা প্রতিবন্ধকতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে। পক্ষান্তরে মুসলিম দেশে যদি এ মতবাদ চালু করা হয় তাহলে ইসলাম শক্তিহীন ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়বে। কারণ ইসলাম কোনো ব্যক্তির জন্য পোপ, যাজক, এক্লিউরিস এর মত আধিপত্য অনুমোদন করে না।

• ইসলাম কেন স্যাকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) প্রত্যাখান করে?

স্যাকুলারিজম (ধর্মহীনতা) যা আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা নামে প্রসিদ্ধ তা মানব প্রকৃতির একটি বিশেষ দিককে উপেক্ষা করে। দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি। ধর্মনিরপেক্ষতা মানুষের দেহের চাহিদা পূরণের উপর গুরুত্বারোপ করে। কিন্তু আত্মার চাহিদার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করে না।

পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এ মতবাদটির উৎপত্তি হয়েছে। আমরা প্রাচ্যবাসীদের নিকট এটি একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত অজানা অচেনা চিন্তাধারা বৈ কিছু নয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলে। যার ফলে ব্যক্তিতন্ত্র, জাতেভেদ তথা উঁচুনীচু বৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, মতবাদভিত্তিক বিভেদ, গোত্রীয় বিভেদ, জাতীয়তাভিত্তিক বিভেদ, দলাদলি, শ্রেণী বৈষম্য ইত্যাদির উন্মেষ ঘটে।

এই মতবাদ নাস্তিকতা, পাশবিকতা, বিচ্ছিন্নতা, দুর্নীতি, প্রজন্মের বিনাশ ইত্যাদির প্রসার ঘটায়।

- ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদেরকে পাশ্চাত্যের বিবেক দিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করে। যার ফলে আমরা নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশাকে নিন্দা করব না। আমরা মুসলিম সমাজের স্বভাব-চরিতকে ভুলুণ্ঠিত করব এবং অনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য সমাজের রুদ্ধদারকে খুলে দেব। ধর্মনিরপেক্ষতা সুদী কারবারের বৈধতা দেয় এবং সিনেমা, নাটক, চলচ্ছিত্র ইত্যাদি শিল্প হিসেবে অতি মর্যাদা দেয়। ধর্মনিরপেক্ষতার ছায়াতলে প্রত্যেক মানুষ অন্যের ক্ষতি করে হলেও নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস চালায়।

ধর্মনিরপেক্ষতা পাশ্চাত্য সমাজের সমস্যাগুলো আমাদের সমাজে টেনে আনে। যেমন পরকালের হিসাবনিকাশকে অস্বীকার করা। যার ফলশ্রুতিতে মানুষ ধর্মীয় ভাবধারার বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে জাগতিক রিপু যেমন- লোভলালসা, ব্যক্তিস্বার্থ, অস্তিত্বের লড়াই ইত্যাদি দ্বারা তাড়িত হয়ে জীবন যাপন করে; সেখানে আত্মার বিবেচনা একেবারে শূণ্য।
ধর্মনিরপেক্ষতা বিকাশ ঘটলে জাগতিক জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়; যে জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ নির্ভর। গায়েবী বিষয়াবলীকে উপেক্ষা করা হয়। যেমন আল্লাহর উপর ঈমান, পূণরুত্থান, পূণ্য ও পাপ। এর ফলে এমন এক সমাজের উদ্ভব ঘটে যে সমাজের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে- দুনিয়ার ভোগ ও সস্তা সব খেলতামাশা।

• ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসার ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির কেন্দ্রবিন্দু

ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তি ইউরোপে। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা রাজনৈতিক অস্তিত্ব অর্জন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গোটা ইউরোপ জুড়ে ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তার লাভ করে। বিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও মিশনারীর প্রভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে রাজনীতি ও শাসনকার্যে ধর্মনিরপেক্ষতা ছড়িয়ে পড়ে।

সেক্যুলারিস্ট মুসলিম

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুসলিম। এরা প্রথম থেকেই আমেরিকার পকেটে রয়েছে। তাই এদের নিয়ে আলাদা চিন্তা বা মাথাব্যথা নেই। এরা কারও জন্য কোনো ঝুঁকির কারণ নয়। সেক্যুলারিস্ট মুসলিমরা মূলত মুসলিমই নয়। কারণ, তারা ইসলামকে কেবল ব্যক্তি-জীবনে পালনীয় ধর্ম মনে করে এবং রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা মনে করে। এদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি থাকবে ধর্মের বলয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। রলস-এর ভাষায় এরাই হলো লিবারেলিস্ট। ১৪৬

এমন সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী নীতি অনেক পশ্চিমা দার্শনিকের বক্তব্যেও পাওয়া যায়। যেমন রুশো বলেছেন, 'পৃথিবীর যে সৃষ্টিই পাশ্চাত্য সমাজ ও জীবনধারা অস্বীকার করে, সে নিজেকে মানুষ দাবি করার যোগ্য থাকে না। নফসপূজারি না হওয়াই একজন মানুষের পাগল হওয়ার দলিল হিসেবে যথেষ্ট। এই সভ্য সমাজে এমন সন্ত্রাসীদের বিহিত শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমেই করতে হবে আমাদের সভ্যতার জন্য তাদের হুমকি হয়ে ওঠার আগেই। আর যদি কোথাও পুরো সমাজই এমন সন্ত্রাসী হয়ে যায় (যেমন তালেবান) তা হলে যেসব সভ্য সমাজ আমাদের নীতি মেনে নিয়েছে, তাদেরকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মাধ্যমে সেই সন্ত্রাসী সমাজের বিরুদ্ধে মিশনের বৈধতা দেওয়া হবে। এমন অসভ্য, জঙ্গি লোকদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হবে, যেন বাকি মানব-সমাজ 'হিউম্যান' হয়ে জীবনযাপন করতে পারে।

মুসলিমদের সাথে পাশ্চাত্যের আচরণবিধি প্রসঙ্গে এখানে র‍্যান্ডের প্রতিবেদনগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো এটা স্পষ্ট করা যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা কতটা সাম্প্রদায়িক। তবে আমাদের জন্য এই রিপোর্টগুলোতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ইসলামকে বিকৃত ও পাশ্চাত্যকরণের পিছনে তাদের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে জানা ও বুঝা। এর পিছনে কারা, কীভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং তাদের কাজের পদ্ধতিগুলো ইসলামের সাথে কেন সাংঘর্ষিক- এই বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ নিয়ে পৃথক গ্রন্থের প্রয়োজন। আমরা দোয়া করব আল্লাহ উম্মাহর এই প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন ইনশাআল্লাহ।

রুশোর বক্তব্যে সরাসরি পাশ্চাত্য সমাজের কথা উল্লেখ নেই। সে খায়েশ পূরণের জন্য গঠিত সামাজিক কাঠামোর কথা বলেছে। আর এটাই পাশ্চত্য সমাজব্যবস্থার মূল উপাদান।

বিভিন্ন সময় আমাদের মুসলিম ভাইদের গ্রেফতার দেখানো হয়। তাদের অপরাধ হিসেবে দেখানো হয়, তারা গণতন্ত্র কিংবা সেক্যুলারিজমে বিশ্বাসী নয়। এগুলোকে তারা কুফুরি ব্যবস্থা মনে করে। এই অপরাধের কারণেই একটা সেক্যুলার রাষ্ট্র তাদের বসবাসের অধিকার কেড়ে নেয়। কারণ তাদের ল' অফ পিপলস অনুযায়ী এরা পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য চরম হুমকি। এজন্যই পশ্চিমাবিশ্ব এদেরকে চরমপন্থি হিসেবে আখ্যায়িত করে; অথচ কোনো মুসলিমই এসব মতবাদে বিশ্বাসী হতে পারে না।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এসব পাশ্চাত্য মতবাদকে অধিকাংশ মুসলিমই আজ আদর্শিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। আমরা যদি সত্যিই নিজেদের ঈমানের ব্যাপারে সিরিয়াস ও সংবেদনশীল হই তা হলে আমাদের উচিত এসব মতবাদ প্রত্যাখ্যান করা। আজকে আমরা মুসলিম নাম ধারণ করেও পাশ্চাত্যের ল' অফ পিপলস মেনে নিচ্ছি; অথচ নিজেদের ল' অফ পিপলস বিকৃত

করছি। যারা ইসলামের ল' অফ পিপলস প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদেরকে উগ্রবাদী বলে দূরে ঠেলে দিচ্ছি। আমাদের জন্য উচিত ছিল পাশ্চাত্যের ল' অফ পিপলস দেখে নিজেদের শত্রু-মিত্র চিনে নেওয়া। পাশ্চাত্য কেন মুসলিমদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করল, কেন প্রত্যেক ক্যাটাগরির সাথেই ভিন্ন ভিন্ন আচরণবিধি নির্ধারণ করল, এর পেছনে কী তাদের উদ্দেশ্য- এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবলে আমরা অবশ্যই আমাদের শত্রু-মিত্র চিনতে পারব। সাথে সাথে এই পরিস্থিতিতে নিজেদের করণীয়ও নির্ধারণ করতে পারব। দরকার কেবল নিজেদের ঈমান ও দীনের ব্যাপারে একটু সিরিয়াস হওয়ার।
আমরা আমাদের ও অধীনদের ক্ষেত্রে বাস্তব বিশ্বাসে বিশ্বাসী হব ও তার উপর আমল করব। এতেই ক্ষান্ত হব না, বরং মানুষদেরকে আহ্বান করব ও ইসলামের হাকিকত সম্পর্কে বুঝাব। কিভাবে আমাদের শত্রুরা ভেতরে-বাইরে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তাদেরকে সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক করব। মুসলিম উম্মাহ বর্তমান কি পরিমাণ দুর্দশায় ভোগছে তাও তুলে ধরব তাদের সামনে। কোনো কষ্ট, বাঁধা ও বিরোধিতা আমাদেরকে এ দায়িত্ব থেকে বিরত রাখতে পারবে না। যদিও ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী ও তার দোসররা আমাদেরকে কোণঠাসা করে কিংবা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, আমরা তার থেকে পিছপা হব না কখনো।

অবশ্যই আমাদেরকে দ্বীনের স্বার্থে দ্বীন মোতাবেক কাজ করতে হবে। আল্লাহ ও তার রাসূলের পছন্দনীয় আকিদা, কথা ও কর্মের উপর মানুষদের উঠাতে হবে, প্রয়োজনে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে হবে। আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে, যেন ফিতনা দূরীভূত হয় ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।

• উপসংহার

পূর্বের আলোচনা থেকে এ কথা পরিস্কার যে রাষ্ট্রীয় জীবন ও সামাজিক জীবন থেকে ধর্মকে বহিষ্কার করে জাগতিক জ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধির ভিত্তিতে জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার আহবানই- ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মতে, ধর্ম মানুষের মনের খাঁচায় বন্দি থাকবে, খুবই সীমাবদ্ধ পরিসরে ধর্মকে প্রকাশ করা যাবে। অথচ যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়তকে আইন হিসেবে গ্রহণ করে না এবং আল্লাহ তাআলা যা কিছু হারাম করেছেন সেগুলোকে সে নিষিদ্ধ করে না- সে মুরতাদ, সে মুসলিম নয়। দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তার যুক্তি খণ্ডন করা ও তাকে তওবা

করার আহ্বান জানানো ওয়াজিব- যেন সে ইসলামে ফিরে আসার সুযোগ পায়। অন্যথায় ইহকালে ও পরকালে তার ব্যাপারে ইসলাম ত্যাগকারী মুরতাদের বিধান প্রযোজ্য হবে।

রেফারেন্সসমূহ :

১. সেক্যুলারিজম ও ইহজাগতিকবাদ - অধ্যাপক ফজলুর রহমান
২. হিউম্যান বিয়িং: শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব - ইফতেখার সিফাত
৩. https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10668
৪.https://www.drfirozmahboobkamal.com/blog/%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a7%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a6%bf/